Pret by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com
প্রেত
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
মূর্ছনা

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

প্রথম অংশ

অন্ধকার জগৎ

এক

রুমী বরাবরই একেবারে সাধারণ ছেলে। সাধারণ ছেলেদের মতো তাকে কেমন দেখাচ্ছে সে নিয়ে তার মাথাব্যথার শেষ ছিল না। ক্লাসের ফিটফাট ছেলেদের দেখে তাই তার ভিতরে হীনমন্যতা জেগে উঠতো। ঘুরেফিরে দুটি প্যান্ট পরেই তাকে ক্লাসে আসতে হয়, ব্যাপারটা অন্যেরা লক্ষ্য করছে কিনা সে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার সীমা নেই। টিউশানির টাকা পেয়ে সে যখন হাল ফ্যাশানের চওড়া কলারওয়ালা নূতন একটা শার্ট তৈরি করলো তার ভিতরে তখন আনন্দের একটা জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। সে সেই শার্ট পরে দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় সাবধানে দোকানের আয়নায় নিজেকে লক্ষ্য করতো। তার চেহারা মোটামুটি ভালো এ নিয়ে সে খুব সচেতন, গায়ের রঙটা আরেকটু ফর্সা হলে তার আর কোনো দুঃখ থাকতো না। অন্যদের দেখাদেখি সে তার চুলকে কান ঢেকে ঝুলে পড়তে দিয়েছে, তাই সেগুলিকে আগের থেকে বেশি যত্ন করতে হয়। কাছে পিঠে কেউ না থাকলে আজকাল সে তার পকেট থেকে ছোট একটা চিরুনি বের করে অনেক যত্ন করে চুল ঠিক করে নেয়। তার বয়সী অন্য যে-কোনো ছেলেদের মতো রুমীরও মেয়েদের নিয়ে খুব আগ্রহ। রাস্তাঘাটে কোথাও কোনো মেয়ে তাকে আলাদা করে লক্ষ্য করে কিনা সেটা জানার তার খুব কৌতূহল। কখনো কোনো কারণে কোনো মেয়ে ঘুরে দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকালে সে সারাদিন ঘটনাটি ভুলতে পারে না। এমনিতে সে খুব মুখচোরা, কোনদিন যেচে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলবে এরকম সাহস নেই ; অথচ প্রায়ই সে কল্পনা করে একটা আধুনিকা মেয়ে তার জন্যে পাগল হয়ে আছে। প্রতিবার নূতন টিউশানি নেবার আগে সে মনে মনে আশা করে একটি সুন্দরী মেয়েকে পড়াবে, কিন্তু কখনোই তা হয়ে ওঠেনি। কে জানে, সুন্দরী মেয়েদের বাবারা হয়তো উঠতি বয়সের কলেজের একটা ছেলের হাতে মেয়েকে অংক কষতে দেয়ার সাহস পান না।

রুমীর সবচেয়ে বড় সমস্যা তার নিজেকে নিয়ে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করে কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মফঃস্বলের ছেলে। ক্লাসের ফিটফাট ইংরেজী কথা বলা ছেলেদের সে মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করে। শুদ্ধ ইংরেজীতে সে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যেতে পারে, কিন্তু মুখে মুখে সে ইংরেজীতে একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। চেষ্টা করে দেখেছে, তার গ্রাম্য ক্লাস-টীচারের সুর এসে পড়ে। বৃদ্ধ ক্লাস-টীচারের তাকে নিয়ে যত গর্বই থাকুক না কেন, রুমীর নিজেকে নিয়ে লজ্জার সীমা নেই। এক সময় ফিটফাট ছেলেদের সাথে সে মেশার চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু তাদের প্রচ্ছন্ন অবহেলা বুঝতে পেরে সে নিজের মাঝে গুটিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে রুমী কল্পনা করে সে বিদেশ থেকে অনেক বিখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে, আর এই সব ফিটফাট ছেলেরা তার সাথে দেখা করতে এসেছে। সে যেন বিশুদ্ধ সাহেবী ইংরেজীতে বলছেঃ তোমাদের দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক চিনতে পারলাম না তো!

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

রুমীর এই ধরনের অনেক কল্পনা, সাধারণ ছেলেদের মতো তার কল্পনাগুলিও সাধারণ। মোহ্ আর উচ্চাশা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। যা কিছু বিদেশী তাতেই আজকাল তার প্রচণ্ড বিশ্বাস। নিজের দেশের রাজনীতি পর্যন্ত সে বিদেশী সাংবাদিকদের আলোচনা পড়ে শিখতে চেষ্টা করে। দেশকে নিয়ে সে আজকাল সত্যি সত্যি হতাশাগ্রস্ত, বিদেশীরা কিভাবে উন্নতি করে ফেলছে আর এদেশের লোকেরা কিভাবে নিজেদের সর্বনাশ করছে এ ব্যাপারে আজকাল সে বুদ্ধিজীবীদের সাথে একমত। একবার দেশের বাইরে যেতে পারলে সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না এরকম একটা ধারণা আস্তে আস্তে তার ভিতরে গড়ে উঠছে। সার্থক জীবনের অর্থ বিদেশে প্রতিষ্ঠা, এ ব্যাপারে তার আজকাল আর কোনো সন্দেহ নেই। এই আশা নিয়েই সে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছিল, কিন্তু একদিন সেটাতে একটা চোট খেয়ে গেল।

তখন পরীক্ষার মাসদুয়েক বাকি, পড়াশোনার খুব চাপ। বিকেলে একটা টিউশানি করে রুমী খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রটার আলাদা পড়ার ঘর নেই, কাজেই মধ্যবিত্তের সংসারের ঠিক মাঝখানে বসে থেকে তাকে পড়াতে হয়। দৈনন্দিন তিক্ত ঘটনাবলীর মাঝে বসে থেকে প্রায়–নির্বোধ একটি ছেলেকে এক জিনিস দশবার করে বোঝাতে তার দুই ঘন্টা সময়কে দশ ঘন্টার মতো দীর্ঘ মনে হয়। তার উপর কোনদিনই তাকে কিছু খেতে দেয় না, প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে সে উঠে আসে।

চা খেয়ে খিদে নষ্ট করার জন্যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে যেতো। আজকাল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এসে আড্ডা জমায়। তাদের দেখা একটা মজার কাজ। একজন দুজন রুমীর মনের মতো বের হয়ে পড়ে, তাদের সে মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে লক্ষ্য করে সময় কাটিয়ে দেয়। নিজের অগোচরে সে তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে কথাবার্তায়, হাসিতে, পোশাকে, হাঁটার ভঙ্গিতে।

সেদিন বৃষ্টি বলে চায়ের দোকানে ভিড় কম। রুমী জানালার পাশে একটা চা একটা সিংগারা নিয়ে আরাম করে বসেছে। তার ঠিক পাশেই একজন গভীর মনোযোগ দিয়ে গাঁজা ভরা একটা সিগারেট নির্বিকার ভাবে টেনে যাচ্ছে। সামনের টেবিলে বসে দুজন তর্ক করছে—বিষয়বস্তু রুমীর জ্ঞানের বাইরে, কোনো একজন আমেরিকান অর্থনীতিবিদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের যৌক্তিকতা। তর্ক উত্তপ্ত হতেই কথাবার্তায় ইংরেজী বের হয়ে আসতে থাকে। কি সুন্দর উচ্চারণ, কি সুন্দর কথা বলার ভঙ্গি, কি চমৎকার শব্দ চয়ন। রুমী মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

দাদা কি করে আপনাদের?

রুমী গলার স্বর শুনে চমকে তাকায়। গাঁজা খাওয়া লোকটি লাল চোখে কিন্তু মুখে একটা হাসি নিয়ে তর্করত ছেলে দুটিকে জিজ্ঞেস করছে। ছেলে দুটি থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালো। প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে পারেনি ভেবে লোকটি গলা উঁচিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের দাদারা কি করতেন?

এক্সকিউজ মি?

আপনার দাদা, মানে আপনার বাবার বাবা কি করতেন?

কেন?

গরীব ছিলেন কিনা? চাষা, কি গোয়ালা, কি মাঝি?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হোয়াট? একজনের ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে, হোয়াট ডু ইউ মীন?

আহা-হা-হা রাগ করেন কেন? আমি শুধু জানতে চাইছি আপনাদের দাদারা কি করতেন?

কেন? ইটস নান অফ ইওর বিজনেস। আমার দাদা যা খুশি করুক তাতে আপনার কি?

লোকটার মুখে তখনো হাসি। পান খাওয়া দাঁত বের করে বললো, বলতে না চাইলে বলবেন না। লজ্জা করলে বলবেন কেন?

একটা বড় ঝগড়া লেগে যাবার উপক্রম, অন্য ছেলেটা কোনমতে থামিয়ে দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে বের হয়ে গেল। গাঁজা খাওয়া লোকের সাথে ঝগড়া করে কখনো, কি বলতে গিয়ে কি বলেছে!

রুমী আড়চোখে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করে, এমন অভদ্র লোকও আছে! লোকটা তখনো খিক খিক করে হাসছে যেন একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে। রুমীর চোখে চোখ পড়তেই বললো, দশ টাকা বাজি।

রুমী থতমত খেয়ে বললো, বাজি?

হ্যাঁ। ঐ দুইটার ভিতরে অন্তত একটার দাদা গয়লা না হয় ধোপা ছিল।

কেন? রুমী একটু উত্তপ্ত হয়ে যোগ না করে পারলো না, ধোপা কিংবা গয়লা হওয়া দোষ নাকি?

দোষ কেন হবে? লোকটা সাগ্রহে মাথা এগিয়ে আনে, দাদা ধোপা ছিল তাই বাপ খুব কষ্ট করে বড় হয়েছে। এখন ছেলেদের তাই সাহেব বানাচ্ছে। ভুলতে পারে না তো নিজে ধোপার পোলা! এমন সাহেবের সাহেব যে বাড়িতেও ইংরেজী ছাড়া কথা বলে না।

রুমী যুক্তিটার মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝে চুপ করে রইলো। লোকটার তাতে নিরুৎসাহিত হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজের মনে সে মা-বাপ তুলে গালিগালাজ দেয়া শুরু করে।

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসে রুমী তাড়াতাড়ি নিজের চা শেষ করার চেষ্টা করতে থাকে। উঠে পড়া ভালো, কে জানে আবার কখন তাকে ধরে বসবে।

ইংরেজী। ইংরেজী বলেন! লোকটা আবার শুরু করে, জার্মান বলে না কেন? স্প্যানিশ বলে না কেন? ফ্রেঞ্চ বলে না কেন?

প্রশ্নগুলি রুমীকে নয়, তাই রুমী চুপ করে থাকে। তাড়াতাড়ি চা খেতে গিয়ে তার জিভ গেছে পুড়ে, রাগটা উঠছে এই লোকটার উপর। লোকটা হঠাৎ দুই হাত মাথার উপরে তুলে নাচার ভঙ্গি করলো, ইংরেজী বলে কারণ তাদের ব্রিটিশ বাবারা ইংরেজীতে কথা বলেন। তারা তিনশো বছর তাদের পাছায় লাথি মেরে গেছেন, এখন তাদের ভাষায় কথা না বললে চলে কেমন করে? কর্তায় কইছে শালার ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই।

লোকটা হঠাৎ তার দিকে ঘুরে বললো, ঐ ব্রিটিশ বাবারা কি তাদের মানুষ বলে জানতো? জালিয়ানওয়ালা বাগে ডায়ার যখন চারশো লোককে কুত্তার মতো গুলি করে মেরে নিজের দেশে ফিরে গেছে তখন তার দেশের লোক কি করেছিল?

রুমীর চা শেষ। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কি করেছিল?

ব্রিটিশেরা চাঁদা তুলে ডায়ারকে ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড উপহার দিয়েছিল। আর আমরা এখনো সেই ব্রিটিশের ইয়ে ধরে লাফাই। লোকটা অশ্লীল একটা কথা বলে মাটিতে একদলা থুতু ফেললো।

রুমী আর দাঁড়ালো না, পয়সা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে এলো। লোকটার পুরোপুরি মাথা খারাপ।

পরের কয়দিন কিন্তু ঘুরেফিরে লোকটার কথাগুলি মনে হতে থাকে রুমীর। বিশেষ করে সেই ইংরেজটার কথা, এদেশের মানুষকে খুন করেছিল বলে যাকে নিজের দেশের লোকেরা খুশি হয়ে চাঁদা তুলে টাকা উপহার দিয়েছে। কথাটি কতটুকু সত্যি জানার জন্যে ওর ভিতরটা উশখুশ করতে থাকে। কাউকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, ক্লাসের বন্ধু বান্ধবেরা তার মতোই ইতিহাস বইয়ে শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণপনা আর বীরত্বের কথা পড়ে এসেছে। সত্যি কথাগুলো কোথাও লেখা নেই। রুমী কথা প্রসঙ্গে ফিটফাট ছেলেগুলিকে জিজ্ঞেস করে একদিন, তারাও কিছু জানে না। একজন শুধু বললো টাগোর নাকি ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ নিজের স্যার উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রুমী স্কুলে শিখেছিল প্রপার নাউনের নাকি ইংরেজী হয় না, কিন্তু ঠাকুরের ইংরেজী কেমন করে টাগোর হল? রুমী অবাক হলো আগে কখনো ওর এই প্রশ্নটি মনে হয়নি কেন ভেবে।

কয়দিন পর এক বিকেলে কোনো কাজ খুঁজে না পেয়ে সে পাবলিক লাইব্রেরিতে 'পাক ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ' নামে একটা বই বের করে পড়তে বসে যায়। রাতে পরীক্ষার পড়া আছে তাই বেশিক্ষণ পড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। এমনিতেও তার পাঠ্য বই এবং পত্রপত্রিকা ছাড়া আর কিছু পড়ার অভ্যাস নেই, একটা কথা তিন চার বার পড়ে বুঝতে হয়। সন তারিখ দিয়ে কণ্টকিত ইতিহাস পড়ে কিছু বুঝে ওঠাও মুশকিল। রুমী ঘন্টা দুয়েক চেষ্টা করে খানিকটা বিরক্ত হয়েই উঠে এলো। প্রথম যে ইংরেজ মোগল বাদশাহদের সুনজরে পড়ার চেষ্টা করেছিল সে-ব্যাটা পরিষ্কার জোচ্চোর ছিল, দুই ঘন্টা পড়ে এইটুকু মাত্র জ্ঞান লাভ হয়েছে। ফিরে যাবার সময় রুমী ঠিক করে এই শেষ, আর সে বাজে সময় নষ্ট করবে না। কবে কখন কোন্ ইংরেজ কার কি ক্ষতি করেছে তাতে তার কি?

পরদিন বিকালে কিন্তু রুমী আবার পাবলিক লাইব্রেরিতে ফিরে এসে ঠিক ঐ বইটা খুঁজে বের করে।

সেদিন রুমী লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে আসে অনেক রাতে, লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবার পর। পরীক্ষার পড়া আজ আর হলো না, কিন্তু তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। সে মাঝে মাঝেই এরকম ছুটি নেয়, বিশেষ করে পরীক্ষার আগে। পড়ার চাপটা মাঝে মাঝে অন্য কিছু করে বের করে দিতে হয়। আজ অবশ্যি অন্য ব্যাপার। সিপাহী বিদ্রোহের পুরোটা শেষ না করে সে কিছুতেই উঠে আসতে পারছিল না। ও জানতো না ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব দূর করার শেষ চেষ্টাকে ইংরেজরা কি নির্মম ভাবে দমন করেছিল। বিদ্রোহী সিপাহীদের ফাঁসী দিয়ে হত্যা করেই সন্তুষ্ট হয়নি, তাদের মৃতদেহ কানপুর থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত পুরো রাস্তার দু'পাশের গাছ থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল। নীলক্ষেতের অন্ধকার রাস্তায় বড় বড় গাছগুলির নিচে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রুমীর মনে হয় সে বুঝি

কানপুরের রাস্তা ধরে হাঁটছে, আর দু'পাশের গাছ থেকে বিদ্রোহী সিপাহীদের মৃতদেহ ঝুলছে—প্রচণ্ড রাগে রুমীর দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

রুমীর পরিবর্তন হয় খুব তাড়াতাড়ি। শুধুমাত্র পাক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস পড়েই ওর কাছে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। ইংরেজদের দুইশো বছরের শাসন এদেশের মানুষের মনোভাবকে কি রকম ভাবে নষ্ট করেছে সে প্রথমবার বুঝতে পারে। এখনো কেউ ইংরেজী লিখতে গিয়ে ভুল করলে তার লজ্জায় মাথা কাটা যায়, কিন্তু বাংলা লিখতে ভুল করলে ভিতরে এতটুকু অপরাধবোধ পর্যন্ত জন্মায় না। যে-সব ছেলেদের দেখলে এক সময় রুমী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো আজকাল তাদের দেখলে তার ঘেন্নায় বমি আসতে চায়। আরও অনেক ব্যাপারেই রুমীর ধারণা আজকাল স্পষ্ট হয়ে আসছে। আগে রাজনীতি নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি, ক্লাসের যে কয়টা ছেলে রাজনীতি করতো তাদের জন্যে ওর অনুকম্পা হতো, আজকাল তাদের সে রীতিমত শ্রদ্ধা করা শুরু করেছে। ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক, তারা দেশের জন্যে নিজেদের সময়, শক্তি, সামর্থ্য এমন কি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত নষ্ট করতে প্রস্তুত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়সী ছেলেরা কিভাবে দেশের জন্যে যুদ্ধ করেছে সে খানিকটা বুঝতে পারে। নিজের দেশকে নিয়ে তার ভিতরে গর্ব হতে থাকে, গোপন প্রেমের মতো সেটা ওকে আশ্চর্য ভাবে আনন্দ দেয়।

আবার একদিন সেই অভদ্র মাথা খারাপ লোকটির সাথে দেখা হলো রুমীর। দেখা হলো সেই একই জায়গায়, একই ভাবে, লোকটা গম্ভীর মুখে নির্বিকার ভাবে গাঁজা ভরা সিগারেট টানছে। আজকে কেন জানি রুমীর লোকটাকে এতোটা খারাপ লাগলো না, সামনে বসে বললো, ভালো আছেন?

মাথা নেড়ে হাসলো লোকটি যেন কতকালের চেনা। রুমী বুঝতে পারে লোকটি তাকে চেনেনি, চেনার কথা না। চায়ে চুমুক দিয়ে রুমী জিজ্ঞেস করলো, মনে আছে একদিন দুজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাদের দাদারা কি করে?

মনে পড়ার সাথে সাথে কৌতুকে লোকটার চোখ নেচে ওঠে, দশ টাকা বাজি! অন্তত একটার বাবা গয়লা না হয় ধোপা···

রুমী একটু হেসে প্রসঙ্গটা পাল্টানোর জন্যে বলে, আপনি ডায়ারের কথা বলেছিলেন মনে আছে? যে জালিয়ানওয়ালা বাগে···

বলেছিলাম নাকি?

হ্যাঁ। ডায়ারকে তো লণ্ডনে গুলি করে মেরেছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। উধম সিং, উধম সিং! অন্য ডায়ারকে মারতে পারেনি ওই ব্যাটা আগেই মরে গেছে। একই সময়ে একই জায়গায় দুই কুত্তার বাচ্চা দুইটার নামই এক! লোকটা হঠাৎ কথা বন্ধ করে ঘুরে ভালো করে রুমীকে দেখলো, তোমার কি ইতিহাসে খুব উৎসাহ?

না, খুব নয়। আসলে সেদিন আপনার মুখে জালিয়ানওয়ালা বাগের কথা শুনে একটু পড়ে দেখছিলাম।

লোকটার মুখ খুশিতে ছেলেমানুষের মতো হয়ে ওঠে, আমার কথা শুনে? সত্যি? তুমি আরও পড়তে চাও? কি পড়বে বলো?

এইভাবে কিবরিয়া ভাইয়ের সাথে পরিচয় রুমীর।

কিবরিয়া ভাইয়ের কোনো ভালো গুণ নেই, তিনি স্বার্থপর এবং হিংসুটে। পৃথিবীর কোনো লোককে তিনি পছন্দ করেন না। তিনি ভীষণ সাম্প্রদায়িক। বয়স্ক লোকদের মাঝে হিন্দুবিদ্বেষ বিচিত্র নয়, কিন্তু কিবরিয়া ভাইয়ের ভিতর এই বয়সে এতো হিন্দু বিদ্বেষ কিভাবে গড়ে উঠেছে বোঝা মুশকিল। তিনি যে শুধু সাম্প্রদায়িক তাই নয় তার প্রখর আঞ্চলিকতাবোধ। কোনো কোনো জেলার লোকজনের সাথে তিনি কথা পর্যন্ত বলতে রাজি নন। দেশের প্রায় সব ক'জন বুদ্ধিজীবীকে তিনি উঠতে বসতে মুখ খারাপ করে গালি দেন। কে কবে কখন কি ধরনের নোংরামি করেছিল সব তার নখদর্পণে। নিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কাজেই মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষকদের দুবেলা মুণ্ডুপাত করার অধিকার আছে তাঁর। সবসময়েই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলেন, তাই কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারে না। এমনিতে খিটখিটে এবং বদমেজাজী, সাধারণ লোকজনের জন্যে কোনো সম্মানবোধ নেই। রুমী নিজে কিবরিয়া ভাইকে এক রিক্সাওয়ালার সাথে কথা কাটাকাটি করে চড় মারতে দেখেছে। তারপর সমস্ত রিক্সাওয়ালারা একত্র হয়ে উল্টে কিবরিয়া ভাইকে সে কি মার! রুমী কোনমতে সেবার প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। এরপর থেকে তিনি রিক্সাওয়ালাদের দুই চোখে দেখতে পারেন না। কিবরিয়া ভাইয়ের বয়স খুব কম নয়, কিন্তু এখনো বিয়ে করেননি, রুমীর ধারণা কোনো মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। জগৎ সংসারের ভালোমন্দ সবকিছুর উপরে এরকম খেপে থাকা লোক রুমী আগে কখনো দেখেনি।

কিবরিয়া ভাইয়ের একটি ব্যাপার অবশ্যি প্রশংসা করার মতো, সেটি হচ্ছে তাঁর পড়াশোনা। গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস ছাড়া আর সব ধরনের বই পড়ায় তাঁর সমান উৎসাহ। এমন কোনো বিষয় নেই যা সম্পর্কে তিনি পড়েননি এবং তাঁর বেশ ভালো ধারণা নেই। এতে অবশ্যি লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশি, তর্কবিতর্ক কথা কাটাকাটিতে তিনি প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে তাঁর সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডার এত নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেন যে প্রতিপক্ষ কখনো তাঁকে ক্ষমা করতে পারে না। রুমী এখন পর্যন্ত একটি লোকও খুঁজে পায়নি যে কিবরিয়া ভাইকে পছন্দ করে বা যাকে কিবরিয়া ভাই পছন্দ করেন। সে নিজে তাঁর থেকে অনেক ছোট বলে কিবরিয়া ভাই কখনো তার সাথে লাগেননি। রুমী যে কিবরিয়া ভাইকে খুব পছন্দ করে তা নয়, কিন্তু একজন মানুষকে ভালো ভাবে বুঝে নিলে তখন তার খারাপ আর ভালো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। তাছাড়া কিবরিয়া ভাইয়ের সাথে কথা বলায় একটা আনন্দ আছে, অনেকটা পরচর্চার আনন্দের মতো। কখন কি পড়তে হবে এবং কোন্ বইয়ে কি পাওয়া যাবে কিবরিয়া ভাই খুব ভালো বলে দিতে পারেন। তিনি নিজে রুমীকে অনেক বই জোগাড় করে দিয়েছেন যেগুলি তার পক্ষে পাওয়া অসম্ভব ছিল।

কিবরিয়া ভাইয়ের সাথে পরিচয় হওয়ার পর রুমী অনেক যত্ন করে পাঠ্য বইয়ের বাইরে পড়াশোনা শুরু করেছে। পৃথিবী সম্পর্কে ওর ধারণা আজকাল প্যাল্টে গেছে। আগে মনে করতো যা ছাপা হয় বিশেষ করে বিদেশী পত্রপত্রিকায় সব বুঝি সত্যি। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সংবাদপত্রগুলি যে খুব যত্ন করে পৃথিবীর খবর নিজেদের মনমতো করে পরিবেশন করে সাধারণ মানুষদের একটা ছাঁচের ভিতর ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে বোঝার

www.MurchOna.com

পর সে তাদের অবিশ্বাস করা শুরু করলো। বিদেশীরা ভালো বললে ভালো এবং বিদেশীরা খারাপ বললে খারাপ এই ধরনের মতাবলম্বী লোকজনের সংখ্যা দেখে রুমী এই প্রথমবার বুঝতে পারে এদেশের সত্যিকার সমস্যা কাদের মাঝে।

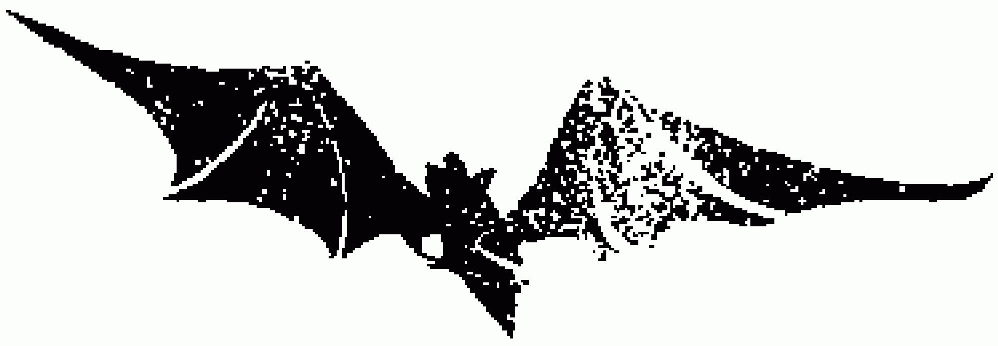

www.MurchOna.com

দুই

পরীক্ষার আর ঠিক দশ দিন বাকি। রুমী নিজের পড়াশোনাতে খুব সন্তুষ্ট। অন্যদের মতো সে নির্দিষ্ট কয়টা প্রশ্নের উত্তর না শিখে পুরো বই পড়ছে। যদিও আজকাল সে প্রচুর বাইরের জিনিস পড়াশোনা করে, সপ্তাহে চারদিন দুটি করে টিউশানি করে তবু তার সময়ের অভাব হয়নি। পড়াশোনা একেবারে নেশার মতো হয়ে গিয়েছে। সবকিছু প্রথমবার পড়ে শেষ করতে অনেক সময় নেয়, দ্বিতীয়বার পড়তে আর ততো সময় নেয় না। তৃতীয়বার পড়তে শুধু যে সময় আরও কম লাগে তই নয় পড়ে প্রচণ্ড একটা আনন্দ হয়। রুমী ছোট একটা নোট বইয়ে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অংশের নাম লিখে তার পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে পড়াশোনার হিসাব রাখছে। তিন তারকা মানে ভালো পড়া হয়েছে, দুই তারকা মানে মাঝারি, এক তারকা মানে খারাপ। তার নোট বইয়ে তিন তারকা খুব বেশি, দুই তারকা খুব কম, এক তারকা নেই বললেই চলে। বাকি দশ দিনে সে তিন তারকাগুলিকে চার তারকা করে ফেলবে, না দুই এবং এক তারকাকে তিন তারকাতে নিয়ে আসবে ঠিক করতে পারছিল না। গত কয়েক বছরের প্রশ্ন যাচাই করলেই বোঝা যায় কোনো কোনো পরিচ্ছেদ না পড়লেও চলে, রুমীর নোট বইয়ে সেগুলিই দুই এবং এক তারকা হিসেবে রয়েছে—অন্যেরা সেগুলি মোটেও পড়ছে না। রুমীর নীতিবোধ আজকাল প্রখর হয়ে উঠছে, প্রশ্ন বেছে পড়ে ভালো করাকে সে জোচ্চুরি মনে করে। একটা ভালো স্কলারশিপ ছাড়া আর কিছুতে তার আকর্ষণ নেই, অন্তত সেটাই সে নিজেকে বোঝায়।

আজ তাই সে একেবারে নতুন একটা জিনিস পড়া শুরু করেছে। কিন্তু খানিকক্ষণ পড়েই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—গত কয়েকদিন পরিশ্রম একটু বেশি হয়ে গেছে। একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে রুমী ঘর থেকে হাঁটতে বের হয়। সে নতুন সিগারেট খাওয়া শিখছে, এখনো সিগারেট ভালো লাগা শুরু হয়নি, খেতে বেশ কষ্টই হয়। সাধারণতঃ ভাত খাবার পর সে সিগারেট খেতে চেষ্টা করে, আজ কি মনে করে এখনই একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। প্রথম দু-তিন টান ওর খারাপ লাগে না, কিন্তু তারপরই গা গুলিয়ে ওঠে। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে রাস্তা ধরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে শুরু করলো। কারো বাসায় যাওয়া যায় কিনা ভাবলো, কিন্তু পরীক্ষার পড়া নিয়ে সবাই ব্যস্ত এখন, যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ঠিক তক্ষুণি তার "বিখ্যাত জ্যোতিষী জোয়ারদারের" কথা মনে পড়লো। বেশ অনেকদিন থেকেই খবরের কাগজে প্রেম-ভালোবাসা, মামলা-মোকদ্দমা, শিক্ষা-সাফল্য, বিদেশ-ভ্রমণ সম্পর্কে জানার "অপূর্ব সুযোগের" বিজ্ঞাপন দেখে আসছিল। সে কোনদিন এসব ব্যাপারে উৎসাহী নয়, কিরোর হাত দেখার বই বারবার পড়েও কোন্‌টা আয়ু রেখা কোন্‌টা হৃদয় রেখা সে মনে রাখতে পারে না। কিন্তু এই জ্যোতিষীর কথা ভিন্ন, তার এক বন্ধু বলেছে মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে জ্যোতিষী নাকি সবকিছু বলে দিতে পারে। রুমীর বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু তার বন্ধুটি খোদার কসম খেয়ে বলেছে যে ছেলেবেলায় তার অ্যাপেনডিসায়টিস অপারেশনের কথাটিও নাকি জ্যোতিষী দিন-তারিখ সহ বলে দিয়েছে। সেই থেকে ওর ইচ্ছে ব্যাপারটি নিজে গিয়ে দেখে, কিন্তু যাওয়া হয়নি। এখন, হঠাৎ করে,

সেখানে যাওয়ার কথা মনে হলো। পকেটে কিছু টাকা আছে, পড়ায় মন বসছে না—এর থেকে ভালো সময় আর হবে না। বাস স্টপে এসে দাঁড়ালো রুমী।

জোয়ারদারের নাম এবং বিজ্ঞাপনের ধরন দেখে রুমীর ধারণা হয়েছিল সাদাসিধে একজন বুড়োমানুষ নিজের বসার ঘরে লোকজনের হাত দেখে কিছু বাড়তি পয়সা রোজগারের চেষ্টা করে, তাই ঠিকানা খুঁজে বের করে জোয়ারদারের ঘর দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। মতিঝিলের এক সম্ভ্রান্ত এলাকায় চোদ্দ তলা দালানের সাত তলায় চমৎকার একটা ঘর আর ছোট একটা বারান্দা নিয়ে জোয়ারদারের হাত দেখার জায়গা। বারান্দায় বসে জোয়ারদার হাত দেখে। একটা পর্দা দিয়ে সেটা ঘর থেকে আলাদা করে রাখা। ঘরটিতে একটা ছোট টেলিভিশন চলছে। এক কোনায় চায়ের সরঞ্জাম এবং কেতলিতে ফুটন্ত পানি ঃ যারা চায় চা তৈরি করে নেবে। চমৎকার সোফা এবং টেবিলে দেশী বিদেশী রঙচঙে পত্রপত্রিকা। ঘরে হালকা আলো। টেলিভিশনের শব্দ কমে এলেই শোনা যায় কোথা থেকে যেন মিষ্টি সেতারের শব্দ ভেসে আসছে। দেখেশুনে রুমী মুগ্ধ হয়ে যায়। যে লোক হাত দেখা পয়সা দিয়ে এতোসব আয়োজন করে ফেলতে পারে সে হয়তো সত্যিই হাত দেখতে পারে। এই প্রথম রুমীর লোকটার প্রতি একটু বিশ্বাস জন্মালো।

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘরের ভিতর এখন রুমী ছাড়া আরও দুজন। তারা ওর পরে এসেছে। রুমীর ঠিক আগে যে এসেছে সে এখন পর্দার ওপাশে হাত দেখাচ্ছে, এর পরেই রুমী। একজন কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট করে সময় নেয়। রুমীর ঘন্টাখানেক সময় এর মাঝে নষ্ট হয়ে গেছে, হাত দেখিয়ে ফিরে যেতে আরও দুই ঘণ্টা। ওর বাসা অনেকটা দূর, একবার বাস বদলাতে হয়। পরীক্ষার আগে এভাবে এতোটা সময় নষ্ট করা ভালো হলো কিনা রুমীর সন্দেহ হতে থাকে।

পাশের ঘর থেকে জ্যোতিষী জোয়ারদার এবং তার সাথে রুমীর আগের লোকটি বের হয়ে আসে। লোকটির মুখ একটু বিমর্ষ, কে জানে ভাগ্য গণনায় কি বের হয়েছে। জোয়ারদার রুমীর দিকে তাকিয়ে বললো, এরপর কে, তুমি?

রুমী মাথা নাড়লো। এসো, বলে জোয়ারদার পর্দা তুলে ওকে ভিতরে ডাকলো।

কি হলো কে জানে হঠাৎ রুমী প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল। ওর মনে হতে লাগলো পর্দার ওপাশে একটা ভয়ানক অশুভ কিছু অপেক্ষা করে আছে। ওর ভিতর থেকে কে যেন ওকে বলছে, পালা পালা বাঁচতে হলে পালা…

রুমীর হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, হঠাৎ সে কুলকুল করে ঘামতে থাকে। জোয়ারদার ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল, ঠাণ্ডা স্বরে বললো, এসো।

রুমীর সারা শরীর আবার কাঁটা দিয়ে ওঠে, কি নিষ্করুণ তীব্র দৃষ্টি! শুকনো গলায় ঢোক গিলে বললো, আমি আজ বরং যাই, আরেকদিন আসবো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

জোয়ারদার এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে। শক্ত লোহার মতো হাত, কিন্তু মরা মানুষের মতো ঠাণ্ডা। রুমীকে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে, সে কী! চলে যাবে কেন? বেশিক্ষণ লাগবে না—এসো।

পর্দার এপাশে ছোট বারান্দা, মাঝখানে ছোট একটা টেবিল। টেবিলের দুই পাশে দুটি চেয়ার। টেবিলের উপর একটা টেবিল ল্যাম্প, একটা টেলিফোন আর একটা বড়

www.MurchOna.com

ম্যাগনিফাইং গ্লাস, আর কোথাও কিছু নেই। বারান্দায় রেলিঙের উপর দিয়ে ঢাকা শহর দেখা যায়। নিওন লাইট জ্বলছে নিভছে, মাঝে মাঝে গাড়ির শব্দ। মতিঝিলের এই এলাকাটা সন্ধ্যার পর এমনিতে খুব চুপচাপ হয়ে পড়ে।

জোয়ারদার একটা চেয়ারে বসে তাকে অন্যটাতে বসতে ইঙ্গিত করে। রুমী যন্ত্রের মতো চেয়ারে বসে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। খামোকা আমি ভয় পাচ্ছি, রুমী নিজেকে বোঝাতে শুরু করে, এই লোক আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বাইরে আরও দুজন লোক বসে আছে, আমার ভয় কিসের? লোকটার বিজনেস হাত দেখা, হাত না দেখে ছাড়তে চাইবে কেন? রুমী ঘামে ভেজা ডান হাতটা টেবিলের উপর মেলে দেয়।

জোয়ারদার বললো, বাম হাতটাও দেখি। রুমী তার বাম হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

রুমীর মেলে রাখা দুই হাত নিজের দিকে টেনে এনে এক পলক দেখে জোয়ারদার হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নেয়। রুমী জানতেও পারলো না জোয়ারদার যে-রেখাটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নিল সেটি তার পুরো ভবিষ্যৎকে সেই মুহূর্তে কি ভয়ানক ভাবে পাল্টে দিল।

অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাত দুটি দেখলো জোয়ারদার। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, কি নাম তোমার?

রুমী নিজের নাম বলে।

হাত দেখাতে এসেছ কেন?

এটা আবার কোনো প্রশ্ন হয় নাকি? লোকজন হাত দেখাতে না এলে ওর ব্যবসা চলবে কেমন করে? মুখে বললো, এমনি এসেছি, সবাই যেজন্যে আসে।

ও। জোয়ারদার আবার চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কি ভয়ানক নিষ্করুণ দৃষ্টি! সারা মুখে খোঁচা খোঁচা লালচে দাড়ি, শুকনো টেনে থাকা মুখ ঝাঁকড়া লালচে চুল ঝকঝকে সাদা দাঁত আর সবকিছু ছাপিয়ে জ্বলজ্বল করছে তার চোখ দুটি।

জোয়ারদার হঠাৎ টেলিফোনটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে রিসিভার তুলে সাবধানে আস্তে আস্তে ডায়াল করে রুমীর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি এই টেলিফোনটা শেষ করেই শুরু করছি।

ওপাশ থেকে একটা মেয়ে টেলিফোন ধরলো বলে মনে হলো। জোয়ারদার গলা নামিয়ে কথা বলতে শুরু করে, রুমী চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পায় না। কথা বলার ভঙ্গি শুনে মনে হয় কাউকে যেন কিছু একটা নির্দেশ দিচ্ছে। রুমীর খুব অস্বস্তি বোধ হতে থাকে, কেন জানি ওর মনে হয় ওকে নিয়েই কথা বলছে ওরা।

টেলিফোন শেষ করেও জোয়ারদারের শুরু করার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, অন্যমনস্ক ভাবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। রুমী একটু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি দেখলেন হাতে?

ও, আচ্ছা। একটু নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করলো, তোমার জন্ম-তারিখ কত? ডিসেম্বরের কত তারিখ?

তেইশ।

বয়স কত?

www.MurchOna.com

রুমী নিজের বয়স বলে।

জোয়ারদার মাথা নেড়ে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে শুরু করে। অদ্ভুত একটা গলার স্বর, একঘেয়ে ক্লান্ত আবেগহীন। কথা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে অনেকটা দৈববাণীর মতো, থেকে থেকে রুমী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

খুব ছেলেবেলায় তোমার বাবা মারা গেছেন। তাকে খুন করা হয়েছিল---হ্যাঁ, ওর বাবাকে খুন করা হয়েছিল। সবাই জানে ওর বড় চাচা খুন করিয়েছিলেন লোক লাগিয়ে। কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু সবাই জানে। জমি নিয়ে গোলমাল ছিল অনেকদিনের। হাজীপুরের আলিমুল্লা হাজার টাকা পেলে এক কোপে গলা নামিয়ে দেয়। বড় চাচা পাঁচশো দিয়ে বায়না করেছিলেন, কাজ শেষ হবার পর বাকি পাঁচশো। কাজ শেষ করে সেই রাতেই আলিমুল্লা বড় চাচাকে ডেকে তুললো। হাতে লম্বা দা, তখনো রক্ত লেগে আছে। বড় চাচা তাড়াতাড়ি বাকি টাকা দিয়ে দিলেন। আলিমুল্লা তিন মাসের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। তিন মাস পরে সবাই ভুলে গেলে সে আবার ফিরে এলো। শুকনো গিরগিটির মতো চেহারা, কালো কুচকুচে গায়ের রং, পান খেয়ে দাঁত লাল। সবাই জানে হাজার টাকা দিলে আলিমল্লা গলা নামিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে ওর বাবার গলা নামিয়ে দিয়েছিল আলিমুল্লা। কি নিখুঁত হাত, পাশে ওর মা শুয়ে ছিলেন, তাঁর গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। সারা শরীর শুধু রক্তে ভিজে গিয়েছিল। মা চিৎকার করে উঠে বসেছিলেন, আর ঘুম ভেঙে উঠে রুমী দেখেছিল, ওর মায়ের সারা শরীর রক্তে লাল। ও ভেবেছিল ওর মাকে কেউ কেটে ফেলেছে, কিন্তু ওর মায়ের কিছু হয়নি। ওর বাবাকে কেটে ফেলেছিল। নিখুঁত নিশানা, ঠিক গলাটা একে কোপে দুই ফাঁক। রুমী অনেকদিন ভেবেছিল ওর হাজার টাকা হলে আলিমুল্লাকে দিয়ে বলবে বড় চাচার গলা নামিয়ে দিতে। ও ঠিক নামিয়ে দিত। কিন্তু বড় চাচা মরে গেলেন, এমনিতে ভুগে ভুগে মরে গেলেন। শরীরের মাংস পচে খসে খসে পড়তো আর সারা রাত যন্ত্রণায় কাটা মাছের মতো লাফাতেন। সবাই বলতো বদ দোয়া লেগেছে, এতিমের বদ দোয়া···

তোমার মায়ের সাথে তোমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে খুব ছেলেবেলায়।

···মায়ের চেহারা হয়ে গেল ডাইনীর মতো। রুমী কাছে যেতে ভয় পেতো। দাঁতে দাঁত ঘষে ফিট হয়ে যেতেন, সবাই বলতো জিনে ধরেছে। এতো এতো তাবিজ দিল গলায়, মা টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলতেন। একদিন নানা নৌকো করে এসে তার মাকে নিয়ে গেলেন। শুধু মাকে, রুমীকেও না শানুকেও না। রুমীর কি কান্না, শানু তখন কিছু বোঝে না, কিন্তু রুমীর কান্না দেখে তারও চিৎকার করে কান্না। নৌকো করে নানা মাকে নিয়ে গেলেন, মা পাথরের মূর্তির মতো নৌকোয় বসে রইলেন, একবার ঘুরেও তাকালেন না। রুমী নৌকোর সাথে সাথে নদীর তীরে তীরে চিৎকার করে ছুটে যেতে লাগলো। ওর ছোট চাচা ওকে ধরে নিয়ে এলেন, বললেন ওর মা আবার ফিরে আসবেন। রুমী কিন্তু জানতো আর আসবেন না। ওর মা আসলেও আর আসেননি। অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে, কেউ বলেনি, কিন্তু রুমী জানে···

তোমার কোনো আপনজন নেই।

···কে বলেছে নেই? নিশ্চয়ই আছে, শানু আছে। শানু-শানু-শানু গুটি গুটি হাঁটতো উঠনের নেড়ে দেয়া ধানের মাঝে। মোরগগুলিকে তাড়া করতো, মোরগগুলিও বুঝতো ও

www.MurchOna.com

শানু, তাই ভয় পেতো না মোটেই। শানুর গা ঘেঁষে এসে ধান খেয়ে যেতো। শানু কিছু বুঝতো না, ওর মা ওদের ছেড়ে চলে গেছেন তাও বুঝতো না। থালা উল্টে ভাত ছড়িয়ে দিতে মাটিতে, তারপর খুঁটে খুঁটে খেতো মাটি থেকে তুলে। শুধু হাসতো ফোকলা দাঁত বের করে। কিছু বুঝতো না শানু, এতো দুঃখ ওদের তাও বুঝতো না। তারপর একদিন শানুর বিয়ে হয়ে গেল। রুমী জানতেও পারেনি কখন শানু বড় হয়ে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বিয়ের রাতে শানু ওকে সালাম করতে এলো। বড় ফুপু বললেন, ভাইরে শেষবার সালাম করে নে রে, শানু। শুনে হঠাৎ রুমীর বুকটা হা হা করে ওঠে। শানুর ওকে জড়িয়ে ধরে কি কান্না! বলতে চাইছিল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও দাদা, আমি বিয়ে করবো না। রুমী জানে তাই বলতে চাইছিল, কিন্তু বলেনি। কেন বলবে? ভালো প্রস্তাব, ভালো বংশের ছেলে, দোকান আছে সদরে। কতদিন আর চাচাদের সংসারে থাকবে? শানু চলে গেল। কেমন আছে এখন শানু? কতদিন যোগাযোগ নেই—কতদিন! তিন বছর? চার বছর?...

অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছো তুমি। কারো কোনো সাহায্য ছাড়া, একা একা।

...একা একা? হবে হয়তো। বড় ফুপু বললেন, ঢাকা যাবি আমার সাথে? নাইট কলেজে পড়বি। আমার বাজারটা, ইলেকট্রিক বিলটা করে দিবি, তোর ফুপা পারলে প্রেসে একটা চাকরি খুঁজে দেবে। বিলু রীতার পড়াশোনাটা দেখবি। রুমী রাজি হলো। ফুপু এসে কাজের ছেলেটা ছাড়িয়ে দিলেন। রুমী চরকির মতো ঘুরতে থাকে, শখ ছিল পড়াশোনা করে বড় হবে কিন্তু ও কাজের ছেলে হয়ে গেল। বাজার করে, বাসন মাজে, কাপড় ধোয়। ময়লা কাপড় পরে, উচ্ছিষ্ট তরকারি দিয়ে একগাদা ভাত খায়, রাতে রান্নাঘরে মাদুর পেতে ঘুমায়। তখন ওর পরীক্ষার ফল বের হলো। স্টার মার্ক পেয়েছে, চার বিষয়ে লেটার। ক্লাস টীচার সেই গ্রাম থেকে দেখা করতে এলেন একটা নতুন এ. সি. দেবের ডিকশনারি নিয়ে। ওর অবস্থা দেখে একেবারে চুপ মেরে গেলেন, এমন কি ডিকশনারিটা দেয়ার কথা পর্যন্ত মনে থাকলো না। বসার ঘরে সারাদিন বসে রইলেন কিছু না খেয়ে। সন্ধ্যায় ফুপা এলে তার সাথে কথা বললেন, কি বললেন কে জানে ওর ক্লাস টীচার চলে যেতেই ফুপা চিৎকার করে গালি দিতে শুরু করলেন ফুপুকে, তোমার চোদ্দগুষ্ঠির কেউ প্রাইমারি পর্যন্ত পাস করে নাই, আর তুমি আমাকে বলোনি পর্যন্ত যে রুমী ম্যাট্রিক পাস করেছে, স্টার মার্ক, চার সাবজেক্টে লেটার। ওকে দিয়ে তুমি বাসন মাজাও, বাজার করাও। তোমার বাপের গোলাম নাকি? স্কলারশিপ পাবে মাসে দেড়শো টাকা, কয়দিন পরে তোমাকে বাঁদী রাখবে সেটা খেয়াল আছে? ফুপু প্রথমে একটা দুটো কথা বলে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন তারপর ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগলেন। অবস্থা পাল্টে গেল রুমীর, নতুন কাপড় কিনে দিলেন ফুপা, বাইরের ঘরে ওর জন্যে বিছানা পাতা হলো, ঢাকা কলেজে ভর্তি করে দেয়া হলো তাকে। লোকজন এলে ফুপা পরিচয় করিয়ে দিতেন, আমার মেজোশালার ছেলে, চার সাবজেক্টে লেটার, স্টার মার্ক। রুমী অবশ্যি তবু বাজার করে দিত, বিলু রীতার অংক দেখে দিত। স্কলারশিপের টাকা পেয়ে ফুপুকে একটা শাড়ি কিনে দিল, ফুপাকে প্যান্টের কাপড়। তাই পেয়ে কি খুশি! টিউশানি নিল রুমী...

কতক্ষণ ধরে জোয়ারদার কথা বলছিল রুমীর মনে নেই। অন্যমনস্ক ভাবে একঘেয়ে আবেগহীন গলার সুরে রুমীর ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুর্বলতা, আক্রোশ, গোপন কামনা-বাসনার কথা এত অনায়াসে বলে গেল যে রুমীর মনে হতে থাকলো জোয়ারদার নয় সে নিজেই যেন নিজের কথা বলছে। জোয়ারদার কথা বলে সুন্দর ভারি গলায়, নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসে। রুমীর ভিতরটা যেন খোলা বইয়ের মতো পড়ে গেল। কখনো কখনো থেমে যাচ্ছিল ঠিক জুতসই শব্দটা না পেয়ে। তখন ধৈর্য ধরে একটার পর একটা শব্দ ব্যবহার করতে থাকে যতক্ষণ না ঠিক শব্দটা খুঁজে পায়।

আস্তে আস্তে রুমী যেন সম্মোহিতের মতো হয়ে গেল। জোয়ারদারের গলার স্বর যেন ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। সাগরের ঢেউয়ের মতো অর্থহীন কিছু শব্দ ওকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। জোয়ারদারের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে গেল ওর সামনে, কি বলছে কিছু সে বুঝে উঠতে পারছে না। একটি একটি শব্দ সে শুনছে, কিন্তু সব মিলিয়ে তার যেন কোনো অর্থ নেই। যুগ যুগ যেন সে বসে আছে এখানে, এর যেন শুরু নেই, শেষ নেই।

রুমীর চমক ভাঙলো তীব্র একটা আলোর ঝলকানিতে। পর্দা সরিয়ে একটি মেয়ে এসে ঢুকে ছবি তুলেছে, ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে রুমীর। কিসের ছবি তুলেছে মেয়েটি? রুমী ঠিক বুঝতে পারলো না। মেয়েটি ভিতরে এলো না, জোয়ারদারের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি বাইরে আছি। তোমার কাজ শেষ হলে ডেকো।

আমার কাজ শেষ।

রুমী উঠে দাঁড়ালো। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা দশ টাকার নোট কিভাবে দেবে বুঝতে না পেরে টেবিলের উপরে রাখলো। কাউকে টাকা দিতে বা কারো কাছ থেকে টাকা নিতে সবসময়েই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। প্রত্যেক মাসে টিউশানির টাকা নেয়ার সময় ওর এই রকম হয়।

জোয়ারদার কিন্তু বেশ সপ্রতিভভাবে নোটটা নিয়ে পকেটে রাখলো। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা কাগজ বের করে রুমীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, তোমার নাম ঠিকানাটা লিখে দেবে? আমি সবার নাম ঠিকানা রাখছি রেফারেন্সের জন্যে। তোমার যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে দরকার নেই।

রুমীর আপত্তি ঠিকই ছিল কিন্তু কেউ এভাবে বললে না করা মুশকিল। একবার ইচ্ছা হলো একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে দেয়, কিন্তু জেনেশুনে এত বড় মিথ্যা কাজ কিভাবে করে। নাম ঠিকানা লিখে সে উঠে দাঁড়ায়, জোয়ারদার খুব আন্তরিকভাবে তার সাথে হাত মিলিয়ে বলে, তুমি বলছিলে তোমার দেরি হয়ে গেছে। তুমি যদি চাও ইভা তোমাকে পৌঁছে দিতে পারে।

না, না—রুমী ব্যস্ত হয়ে বললো, আমি একাই যেতে পারবো।

মেয়েটি, যার নাম নিশ্চয়ই ইভা রুমীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় বাসা তোমার?

মালিবাগ।

ওঃ কি সুন্দর করে হেসে উঠলো মেয়েটি, আমি এমনিতে রাজারবাগ যাচ্ছিলাম, চল তোমাকে পৌঁছে দিই।

www.MurchOna.com

চমৎকার চেহারা ইভার, চমৎকার শরীরে আরও চমৎকার একটা শাড়ি পরে আছে। কেমন একটা আকর্ষণ আছে মেয়েটার শরীরে একবার চোখ পড়লে আর চোখ সরানো যায় না। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ধারালো, মোটেই মেয়েদের চোখের মতো নয়, সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে।

চল যাই, ইভা রুমীকে নিচে নিয়ে যায়। গাড়িতে উঠে সে রুমীর জন্যে দরজা খুলে দেয়। রুমী তার জীবনে গাড়ি চড়েছে খুব কম, হাতে গুণে বলা যায় কয়বার। বড় হয়ে ছাদ খুলে ফেলা যায় এরকম একটা গাড়ি কিনবে—কালো রঙের—এরকম একটা স্বপ্ন ওর বহুদিনের।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়িটা ঘুরিয়ে ইভা রুমীকে নিয়ে রওনা দেয়। গাড়িতে মিষ্টি একটা গন্ধ, সুন্দরী মেয়েদের গায়ে বুঝি সুন্দর একটা গন্ধ থাকার নিয়ম! রুমী আড়চোখে ইভাকে দেখার চেষ্টা করে।

কি পড় তুমি? তুমি বলে বলছি বলে কিছু মনে করছো না তো? ইভা একটু হেসে বলে, বয়সে তুমি আমাদের থেকে অনেক ছোট হবে।

না, না মনে করার কি আছে—ভদ্রতার খাতিরে রুমীকে বলতেই হলো। এমনিতে কেউ সোজাসুজি তাকে তুমি বলে সম্বোধন করলে তার মোটেই পছন্দ হয় না। চেহারায় এখনো বয়সের ছাপ পড়েনি, গোঁফটা একটু ঘন হলে সে রাখার চেষ্টা করে দেখতো।

কি পড়ছো বললে না?

রুমী বললো সে কি পড়ছে। পরীক্ষা দেবে তাও বললো।

কবে পরীক্ষা তোমার?

এই মাসের আঠারো তারিখ।

তাই? পরীক্ষা তো এসে গেল।

হুঁ।

ইভা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে, রুমী অবাক হয়ে তাকায় ইভার দিকে। পড়াশোনা করোনি বুঝি, তাই হাত দেখাতে গিয়েছিলে?

রুমীও হেসে ফেলে, বলে, না তা নয়। পড়া আমার ঠিকই হয়েছে, এমনি খেয়াল হলো তাই গেলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে ইভা ঘুরে রুমীকে দেখলো, কিছু বললো না। বেশ অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে অনেকটা আপনমনে বললো, খেয়াল হলো তাই গেলে। আশ্চর্য!

এর মাঝে আশ্চর্য কোন্ ব্যাপারটা রুমী বুঝতে পারে না।

রুমীকে ইভা ওর বাসার কাছে নামিয়ে দেয়। রুমী একটু আগেই নেমে পড়তে চাইছিল, কিন্তু ইভা ওকে ঠিক বাসার সামনে না নামিয়ে ছাড়বে না। শুধু তাই নয় ইভা গাড়িতে বসে রইলো যতক্ষণ পর্যন্ত রুমী তার বাসায় গিয়ে না ঢুকছে। এতো রাতে এরকম একটা সুন্দরী মেয়ের গাড়ি থেকে নামছে, ব্যাপারটা কেউ দেখে ফেলছে কিনা এ নিয়ে শঙ্কিত ছিল বলে ও তাড়াতাড়ি বাসায় ঢুকে পড়েছে, তা নইলে ও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতো যে ইভা কাগজ বের করে ওর বাসার নাম্বারটা টুকে নিয়েছে।

কেউই খেয়াল করলো না গত ছয়মাস থেকে জ্যোতিষী জোয়ারদারের ভাগ্য গণনার যে বিজ্ঞাপনটি দৈনিক পত্রিকাগুলিতে ছাপা হচ্ছিল সেটি পরদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

www.MurchOna.com

পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে রুমী হেঁটে হেঁটে নীলক্ষেতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। ওর এক বন্ধুর বাসায় যাওয়ার কথা, নিউমার্কেট থেকে বাস ধরবে। ওর গা ঘেঁষে একটা হালকা নীল রঙের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে ও লক্ষ্যও করেনি। গাড়ি থেকে মাথা বের করে একটা মেয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, রুমী-রুমী!

রুমী ঘুরে তাকিয়ে দেখে ইভা। অবাক হয়ে কাছে এগিয়ে যায়।

কি খবর তোমার? ইভা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, কোথায় চলেছ?

রুমী একটু থতমত খেয়ে বললো, এই এসেছিলাম একটু লাইব্রেরিতে।

এখন কোথায় যাচ্ছ?

কলেজ গেটের দিকে এক বন্ধুর বাসায়।

চলো পৌঁছে দিই, রুমী কিছু বলার আগেই দরজা খুলে দেয় ইভা।

বাসে যেতে ওর আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগতো, ইভা সেখানে ওকে দশ মিনিটে পৌঁছে দিল। অল্প সময়ে বেশি কথাবার্তা হওয়ার সুযোগ নেই। এর মাঝেই ইভা তার পড়াশোনার খবর নিয়েছে। কবে কোথায় পরীক্ষা তাও জেনে নিয়েছে। রুমী মেয়েদের সাথে কথা বলে অভ্যস্ত নয়, তাই পুরো সময়টুকু একটু আড়ষ্ট হয়েই বসেছিল, কথা যা বলার ইভাই বলেছে। সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালের মোড়ে ওকে নামিয়ে দেয়ার পর ও যেন স্বস্তি ফিরে পেয়েছে।

সে-রাতে ঘুরে ফিরে ওর অনেকবার ইভার কথা মনে পড়লো।

পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে রুমী ওর ক্লাসের ক'জন ছেলের সাথে রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। ও খেয়াল করেনি, করলে দেখতে পেতো একটু দূরে গাড়ি নিয়ে বসে আছে ইভা। রুমীকে অন্যদের সাথে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখে ইভা গাড়ি ঘুরিয়ে উল্টোদিকে চলে গেল। একা থাকলে হয়তো আবার রুমীকে গাড়িতে তুলে নিত।

নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানে উবু হয়ে বসে রুমী বই দেখছিল, কে যেন ওর খুব কাছে মাথা এনে ডাকলো, রুমী।

রুমী ঘুরে দেখে ইভা। কি খবর—ইভা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, ভালো?

হ্যাঁ, এই আর কি!

পরীক্ষা কেমন হলো তোমার?

ভাল।

কি করছো এখানে? যাবে নাকি কোথাও?

নাহ্। সাতটার সময় ওর একটা টিউশানি আছে, এখনো খানিকক্ষণ বাকি সাতটা বাজতে, তাই সময় কাটাচ্ছিল। ইভাকে টিউশানির কথা বলতে ওর লজ্জা করলো, বললো অন্য কাজ আছে। শুনে ইভা আর অপেক্ষা করলো না। মিষ্টি করে হেসে বললো, আসি তাহলে, আবার দেখা হবে।

দেখা হোক কি না হোক বিদায় নেয়ার সময় অনেকেই বলে, আবার দেখা হবে, ওটা একটা কথার কথা।

www.MurchOna.com

কিন্তু ইভার কথাটা কথার কথা ছিল না। ও সত্যিই জানতো আবার দেখা হবে। শুধু ইভা নয় আরও অনেকে জানতো আবার দেখা হবে। বহুদিন থেকে ওকে ওরা চোখে চোখে রাখছে। অনেক খুঁজে ওরা রুমীকে পেয়েছে, এখন ওকে কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না।

রুমী যখন সেটা জানতে পারলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

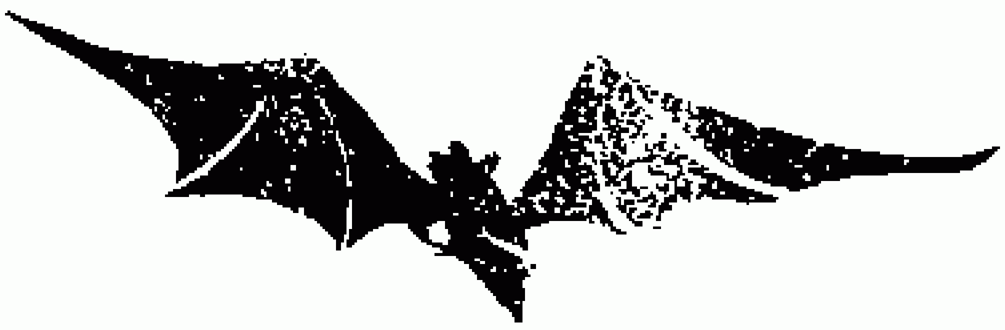

তিন

রুমী বহুদিন হলো শানুকে দেখেনি। সেই কবে শানুর বিয়ে হয়ে গেছে তারপর মাত্র একবার দেখা হয়েছে। ক'দিন আগে শানুর স্বামী ঢাকা এসেছিলেন গুড়ের একটা চালান নিয়ে। ছোটখাটো মানুষ, মুখে সব সময়েই ভালো মানুষের মতো একটা হাসি। সদরঘাটের কাছে কি একটা ঘিঞ্জি হোটেলে ছিলেন সপ্তাহখানেক। রুমীকে খুব যত্ন করে হোটেলে নিয়ে শিককাবাব খাইয়েছিলেন। যাবার সময় খুব করে বলেছেন যেতে। রুমী কথা দিয়েছিল পরীক্ষা শেষ হলে যাবে। তখন ভদ্রলোককে শান্ত করার জন্যেই বলেছিল, কিন্তু পরীক্ষা শেষ হবার পর ও সত্যিই ঠিক করলো যাবে। হকার্স মার্কেট ঘুরে ঘুরে সে শানুর জন্যে একটা শাড়ি কিনলো, শানুর বাচ্চার জন্যে একটা খেলনা গাড়ি। শানুর স্বামীর জন্যে একটা দামী সিগারেট লাইটার, ভদ্রলোক সৌখিন মানুষ কিন্তু প্রাণে ধরে বিলাসিতার জিনিস পয়সা খরচ করে কিনতে পারেন না।

রাত আটটায় ট্রেন। রুমী ছ'টার মধ্যে রওনা দিল। সকাল সকাল গেলে ট্রেনে একটু ভালো জায়গা পাওয়া যাবে। সাথে ছোট একটা ব্যাগ, খামোকা রিক্সা করে না গিয়ে সে বাসেই চলে যাবে ভাবছিল, তাতে অনেকগুলো পয়সা বাঁচে। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করেনি, ওর পাশে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ইভা বললো, কি খবর রুমী, কোথায় যাচ্ছ?

রুমী একটু অবাক হয়ে এগিয়ে যায়, কমলাপুর স্টেশন।

তাই নাকি? চলো তোমাকে পৌঁছে দিই।

বাসে করে যাবার বদলে গাড়িতে করে যেতে আজ ওর কোনো আপত্তিই ছিল না, কিন্তু ও দেখলো গাড়ির ভিতরে আরও দুজন লোক বসে আছে। একজন সামনে ইভার পাশে, আরেকজন পিছনে। অপরিচিত লোকজনের সাথে প্রায়-অপরিচিত আরেকজন মেয়ের গাড়িতে ওঠা কোনো সুখকর ব্যাপার নয়। কিন্তু ততোক্ষণে পিছনের লোকটা পিছনের দরজা খুলে দিয়ে সরে বসে তাকে জায়গা করে দিয়েছে। রুমী একটু ইতস্ততঃ করে উঠে বসে, ইভা সাথে সাথে গাড়ি ছেড়ে দেয়। হঠাৎ করে কেন জানি রুমীর ইচ্ছে হলো নেমে পড়ে, গাড়ির ভিতরে যেন কি একটা অশুভ জিনিস অপেক্ষা করে আছে। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা কি যেন একটা নেমে যায়।

কোথাও যাচ্ছ নাকি? ইভা জিজ্ঞেস করে।

হুঁ।

কটায় ট্রেন তোমার? ভারি গলার স্বর শুনে সে পাশে তাকায়, লোকটিকে সে আগে দেখেছে, জোয়ারদার···সেই জ্যোতিষী।

রুমী শুষ্ক গলায় বললো, আটটায়।

ও। বলে জোয়ারদার কোথা থেকে যেন একটা পকেট ঘড়ি বের করলো। লম্বা চেন লাগানো সাথে। সোনালী রঙের চমৎকার একটা ঘড়ি। উপরে কারুকাজ করা ঢাকনা। ঢাকনা খুলে সময় দেখে বললো, এখনো অনেক সময় আছে।

ঢাকনাটা বন্ধ করে চেনটা ধরে রেখে জোয়ারদার আস্তে আস্তে ঘড়িটাকে ঝুলে পড়তে দিল। গাড়ির অল্প কাঁপুনির সাথে ঘড়িটা চেনের মাথা থেকে দুলছে, এতো চমৎকার কাজ, রুমী চোখ ফেরাতে পারে না ঘড়ি থেকে।

ঘড়িটা আস্তে আস্তে দুলছে জোয়ারদারের হাতে, ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে। তাকিয়ে থেকে থেকে রুমীর কেমন যেন মাথা গুলিয়ে আসে, চোখ সরাতে পারে না সে ঘড়ি থেকে। ভয় পেয়ে যায় হঠাৎ। লাফিয়ে উঠে বসতে চায় সে, কিন্তু আবিষ্কার করে ওর কোনো শক্তি নেই, ওর চোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসছে।

ঘুমাও তুমি, ঘুমাও—কে যেন ওকে বলছে অনেক দূর থেকে।

না, না, না, রুমী প্রাণপণ চেষ্টা করে জেগে থাকতে, ভয়ের একটা শীতল স্রোত ওর চেতনাকে জাগিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না।

ঘুমাও, ঘুমাও তুমি, ঘুমাও।

রুমীর চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসে। গাড়ির সীটে মাথা রেখে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়।

গাড়ি মতিঝিল কলোনির সামনে এসে ঘুরে গেল তারপর ছুটে চললো উল্টোদিকে।

রুমীর ঘুম মাঝে মাঝে হালকা হয়ে এসেছে, কিন্তু একবারও ভাঙেনি। স্বপ্নে দেখছিল উত্তপ্ত মরুভূমির উপর দিয়ে সে প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে আর ওর পিছু পিছু ছুটে আসছে বুনো কুকুরের দল, একটি দুটি নয় হাজার হাজার, অন্ধকারেও তাদের সাদা দাঁত আর হিংস্র চোখ স্পষ্ট দেখা যায়। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে রুমীর, কিন্তু তবু ও থামতে পারছে না, থামলেই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বুনো কুকুরের দল, মুহূর্তে ওকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে ধারালো দাঁত দিয়ে। কিন্তু আর পারছে না রুমী, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল বালিতে, কোনমতে উঠে দাঁড়ালো সে, কিন্তু পা যেন গেঁথে গেছে, কিছুতেই নড়তে পারছে না। লক্ষ লক্ষ বুনো কুকুর ছুটে আসছে—আরও কাছে আরও কাছে—তাদের হিংস্র চিৎকারে কানে তালা লেগে যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর।

প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে রুমী, সাথে সাথে ঘুম ভেঙে যায় ওর। অনেকক্ষণ লাগলো ওর বুঝতে ব্যাপারটা কি। ধক্ ধক্ করে তখনো ওর বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড শব্দ করছে, প্রচণ্ড তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সে শুয়ে আছে একটা অন্ধকার ঘরে আর ঘরের বাইরে সত্যি সত্যি অসংখ্য কুকুর তখনো গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। মনে করার চেষ্টা করলো রুমী কি হয়েছে ওর। আবছা, মনে পড়লো শানুর কাছে যাবার কথা ছিল, কমলাপুর স্টেশনে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ—ইভা!

একমুহূর্তে সবকিছু মনে পড়ে যায় রুমীর, সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে বসে বিছানায়। কোথায় নিয়ে এসেছে ওকে? অন্ধকার ঘর, ভালো করে কিছু দেখা যায় না। ঘরে আর কেউ আছে কি? কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো রুমী, কিছু বুঝতে পারলো না। ছোট ঘর, দরজা জানালা সব বন্ধ, ঘরের একপাশে কি সব জিনিস রাখা। সাবধানে বিছানা থেকে নামে রুমী, হাতড়ে হাতড়ে দেয়াল স্পর্শ করে দরজা খুঁজতে থাকে সে। ঘরটা নোংরা এবং মাঝে মাঝেই ভিজে, ওর পায়ের নিচে কাঠকুটো পাথর চাপা পড়ছে। খুঁজে

www.MurchOna.com

খুঁজে দরজা পেল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু বাইরে থেকে তালা মারা, ও ফাঁক করে দেখতে পায় দরজার কড়ায় মাঝারি গোছের একটা তালা ঝুলছে।

প্রচণ্ড ভয় পেলো রুমী, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর, মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তাকে একটা অন্ধকার ঘরে তালা মেরে আটকে রেখেছে। কি করবে তাকে? মেরে ফেলবে? নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে। কিন্তু কেন মেরে ফেলবে? ইভার কথা মনে পড়ে ওর, জোয়ারদারের কথা। গাড়িতে নিশ্চয়ই তাকে সম্মোহিত করেছিল জোয়ারদার। কি আশ্চর্য ব্যাপার, সে ঐ ঘড়িটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না আর জোয়ারদার তাকে বলে চলছে ঘুমিয়ে পড়তে, কিছুতেই সে জেগে থাকতে পারছে না। কত চেষ্টা করলো জেগে থাকতে অথচ সে ঘুমিয়েই পড়লো শেষ পর্যন্ত। রুমীর সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, ভুরু বেয়ে ঘাম গালের উপর দিয়ে গলার দিকে নেমে যায় স্রোতের মতো।

একটুক্ষণ বসে থাকে সে, তারপর আবার উঠে দাঁড়ায়, হাতড়ে হাতড়ে ঘরটা দেখতে থাকে। কোনো আসবাবপত্র নেই, কোনো জানালা নেই, একটা মাত্র দরজা, তাও বাইরে থেকে তালা মারা। ঘরময় নানা আবর্জনা, ইঁট, গাছের ডাল, মাটি, ভেজা মতন কি সব জিনিস। এক কোণায় ওর পায়ে গোল মতো কি একটা লাগলো। হাত দিয়ে দেখে বেশ মসৃণ, সাবধানে হাতে তুলে নিলো সে। ভিতরটা ফাঁপা, জিনিসটা যতো বড় ওজন তার তুলনায় বেশ কম। সে চোখের কাছে নিয়ে দেখার চেষ্টা করলো, কিছু দেখা যায় না। সাদা মতন একটা কিছু হবে, বোঁটকা গন্ধ রয়েছে মনে হয়। দরজার ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের একটু আলো এসে ঢুকছে, রুমী জিনিসটা সেখানে নিয়ে গেল। সে-আলোতেও ভালো দেখা যায় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ জিনিসটা চিনে ফেললো। সারা শরীর শিউরে উঠলো ওর। হাতে একটা মরা মানুষের করোটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। যেটুকু আলো আসছে তাতে স্পষ্ট দেখা যায়, ও চিনতে পারছিল না কারণ ও কল্পনাও করেনি এটা একটা করোটি হতে পারে।

জন্তুর মতো গোঙানোর আওয়াজ করে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো করোটিটা, সশব্দে পড়ে সেটা গড়িয়ে গেল কোণার দিকে। সারা শরীর কাঁপছে রুমীর, ইচ্ছে হচ্ছে চিৎকার করে পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়, দরজা ভেঙে ছুটে পালিয়ে যায় এই অশুভ ঘর থেকে। কিন্তু ওর কিছু করার নেই, টলতে টলতে বিছানার উপর উঠে বসে, করোটির স্পর্শ মুছে ফেলার জন্যে বিকারগ্রস্তের মতো বার বার হাত দুটি বিছানার চাদরে ঘষতে থাকে।

খুব ধীরে ধীরে ভোর হলো। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে ঘরের ভিতরকার অন্ধকার তরল করে দিলো, আস্তে আস্তে আর একটি একটি করে ঘরের সবক'টা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠলো। রুমী অবাক হয়ে গেল এতক্ষণে কেন পাগল হয়ে যায়নি ভেবে। ঘরের মেঝেতে রয়েছে কাপড়ে জড়ানো একটা শিশুর মৃতদেহ, এমন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে যে দেখেই বোঝা যায় শিশুটি মৃত। রাতে রুমী কিভাবে শিশুটির মৃতদেহে পা দেয়নি সেটাই আশ্চর্য। ঘরের চারদিকে অসংখ্য বাদুড়, সব কয়টির গলা দুভাগ করে কাটা, কুঁকড়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে বাদুড়গুলি। এক কোণে মাটি মাখা মৃত মানুষের হাড়গোড়। দেখে মনে হয় কেউ গোর খুঁড়ে তুলে এনেছে, রাতের সেই করোটিটাও এক কোণায় পড়ে আছে। ঘরের মাঝামাঝি রয়েছে কিছু বড় বড় পাত্র, নানা ধরনের তরল পদার্থ সেখানে,

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

বোঁটকা গন্ধ বের হচ্ছে সেখান থেকে। এসব বীভৎস জিনিসের মাঝে খুব বেমানান লাগছে একগোছা ফুল—এত সুন্দর জবা ফুল সে জীবনে দেখেনি।

সবকিছু দেখে রুমী খুব আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে যায়। কাপড়ে জড়ানো শিশুর মৃতদেহটিও তাকে আর বিচলিত করছে না, মৃত মানুষের হাড়গোড় তার মনে হতে থাকে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। ঘর ভরা এসব বীভৎস জিনিসের ভিতর বসে থেকে তার খিদে পেতে থাকে। সে হাঁটুতে মুখ রেখে অপেক্ষা করতে থাকে কি হয় দেখার জন্যে।

অনেক বেলা করে একজন লোক তালা খুলে ঘরে এসে ঢোকে। মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, হাসিখুশি চেহারা। চোখ দুটির দিকে না তাকালে মনে হয় বুঝি খুব আমুদে মানুষ, চোখ দুটি স্থির, মনে হয় মৃত মানুষের। লোকটা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বাসনপত্র টানাটানি করতে থাকে। ঘরে যে রুমী বসে আছে সেটা যেন ওর চোখেও পড়ছে না। রুমী আস্তে আস্তে বললো, আমি একটু পানি খাবো।

লোকটা কথা শুনেছে কিনা বোঝা গেল না, একমনে নিজের কাজ করতে থাকে। কয়টা বাসন নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সময় রুমী আরেকবার একটু জোরে বললো, আমি একটু পানি খাবো।

লোকটা না শোনার ভান করে ঘরে তালা মেরে চলে গেল। একটু পরে কিন্তু সত্যি এক গ্লাস পানি নিয়ে ফিরে আসে। গ্লাসটা পরিষ্কার, রুমী এক নিঃশ্বাসে ঢক্ ঢক্ করে পুরো পানিটুকু খেয়ে নিল। গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, আমি এখান থেকে যাবো।

লোকটার মুখ দেখে মনে হলো সে যেন ভারি মজার একটা কথা শুনেছে। খিক খিক করে হাসতে হাসতে বললো, তাই নাকি? চেষ্টা করে দেখ না, ভুঁড়ি কিভাবে ফাঁসিয়ে দিই দেখবে না? লোকটা রুমীর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। কি নিষ্করুণ দৃষ্টি! রুমীর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে আর কোনো কথা না বলে বিছানায় বসে থাকে, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল এখন সেটাও কেমন ভোঁতা হয়ে বমি বমি লাগছে।

ঘর থেকে সবকিছু বাইরে নিয়ে সামনের ফাঁকা মতো জায়গাটাতে বেশ কয়েকজন লোক মিলে কি কি করতে শুরু করে। দু'একজন বিভিন্ন বয়সী মেয়েও আছে। একে একে সবাই এসে রুমীকে উঁকি মেরে দেখে গেছে, কেউ কিন্তু একটা কথাও বলেনি। রুমীর নিজেকে মনে হতে লাগলো খাঁচায় আটকে রাখা একটা অদ্ভুত জন্তু। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে বাইরে কি হচ্ছে। একটা বড় আগুন জ্বালানো হয়েছে, চারপাশে ইঁট সাজিয়ে একটা চুলার মতন তৈরি করে সেখানে একটা বড় ডেকচি বসানো হয়েছে। একজন খালি গায়ে ঘর্মাক্ত শরীরে মস্ত বড় একটা হাতা দিয়ে প্রাণপণে ডেকচির ভিতরের ফুটন্ত তরল জিনিসটা নেড়ে যাচ্ছে। এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকজন নানা কাজে ব্যস্ত। কথাবার্তা শুনে মনে হয় একটা বড় উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। রুমীর দিকে পিছন দিয়ে ক'টা লোক কি যেন কাটাকাটি করছে, একজন একটু সরতেই রুমী দেখতে পেল শিশুর মৃত দেহটি। গা গুলিয়ে বমি এসে গেল ওর, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কোনমতে সরে আসে সে। কি ভয়ানক ব্যাপার। এ কাদের পাল্লায় পড়েছে সে? রুমী চোখ বুজে বসে থাকে, কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই—কথাবার্তা ভেসে আসে তখন। সব সে বুঝতে পারে না. কিন্তু একটি দুটি যা শুনতে পায় তাতে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

উল্টাপাল্টা কোপ দিয়ে নষ্ট করিস না।

সবার কি আর তোর মতো মরা কাটার ডিগ্রী আছে!

ডিগ্রী লাগে না, একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলেই হয়। কোথায় রাখবো?

এইখানে এইখানে। এইটুকু মাত্র চর্বি?

দুই বছরের একটা বাচ্চার কতটুকু চর্বি থাকবে? আধমণ?

ভালো বলেছিস…হি হি হি…

দেখো তো রঙটা কেউ, পানসে লাগছে না?

ঠিক হয়ে যাবে, বাদুড়ের রক্তটুকু দিলেই ঠিক রং চলে আসবে।

মনে আছে গতবার, কিছুতেই বাদুড় পাওয়া গেল না, শেষে কয়টা চামচিকে ধরে এনে—

—হি হি হি…

চামচিকে আর বাদুড়ের মাঝে তফাৎ কি? একটা ছোট আরেকটা বড় এ ছাড়া আর কি তফাৎ?

আরে দূর—দুটো একেবারে ভিন্ন জিনিস!

সে কি রক্ত জমে গেছে যে?

ও কিছু হবে না। ঢেলে দাও।

বোতলটা কার কাছে?

কখন শেষ হয়ে গেছে! তুমি আছো কোন্ দুনিয়ায়?

আরেকটা বের করো না কেউ!

বেশি খেয়ো না, তোমার তো লেমনেড খেলেই নেশা হয়ে যায়।

হি হি হি…

একটু পরে বাইরে কথাবার্তা কমে আসে। একজন শুধু বসে বসে বড় ডেকচিতে একটা হাতা দিয়ে নাড়ছে। ঝাঁঝালো কটু গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে। রুমীর কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার, কিন্তু কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। এমন সময় হঠাৎ সে ইভার গলার স্বর শুনতে পায়। এই সর্বনাশী মেয়েটার উপরে তার যতো আক্রোশই থাকুক না কেন এখন সেই হচ্ছে একমাত্র পরিচিত। রুমী দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলো, ইভা এই ইভা!

ইভা একজনের সাথে কথা বলছিল, ঘুরে ওর দিকে তাকালো, কিন্তু তাকে চিনতে পেরেছে সেরকম ভাব দেখালো না। রুমী রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে আবার ডাকে, এবারে কাছে এগিয়ে আসে ইভা, কি হয়েছে?

রাগ দুঃখ হতাশা সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো রুমীর। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর, কোনমতে বললো, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কি হয়েছে?

ইভা নিস্পৃহ ভাবে হাত উল্টিয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করে, রুমী ওকে থামানোর চেষ্টা করে, আমাকে এখানে এনেছো কেন?

কাজ আছে।

কি কাজ?

সময় হলেই দেখবে।

আমাকে কেন?

তোমার মতোই একজন দরকার, ভালো মিডিয়াম।

মানে?

ইভা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়, তুমি বুঝবে না।

রুমী আর কি বলবে বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ইভা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার চলে যাচ্ছিলো, রুমী আবার তাকে থামায়, আমার খুব খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দেবে?

সে কি! তোমাকে কেউ খেতে দেয়নি? ইভা হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। এইটুকু সমবেদনাতেই হঠাৎ করে কেন জানি রুমীর চোখে পানি এসে পড়ে।

ইভা কিছুক্ষণের মাঝেই এক প্লেট বোঝাই খাবার এনে দরজার ফাঁক দিয়ে সাবধানে ঘরের ভিতর গলিয়ে দেয়। রুটি, মাখন, ডিম, মাংসের তরকারি, সবজি এমন কি একটা পেট মোটা বোতলে আধ বোতল মদ। রুমী বুভুক্ষের মতো খাওয়া শুরু করে। ভীষণ খিদে পেয়েছিল ওর, কিন্তু বেশি খেতে পারলো না। হঠাৎ করে ওর পেট ভরে বমি বমি লাগতে থাকে। পান খেতে পারলে হতো একটা, মিষ্টি সুপারি দিয়ে সুগন্ধি একটা পান!

রুমী বাড়তি খাবারটুকু বিছানার নিচে রেখে দিল। আবার কখন ওরা খেতে দেবে কে জানে। মদের বোতলটা ফিরিয়ে দিতে দরজার কাছে এসে দেখে ইভা অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, মুখের ভাব দেখে মনে হয় যেন একটু বিচলিত। যত আক্রোশই থাকুক, এই সর্বনাশী মেয়েটার অস্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যায় না। রুমী ওকে ডেকে বোতলটা ফিরিয়ে দেয়।

খাও না বুঝি তুমি?

রুমী মাথা নাড়লো। ইভা ছিপি খুলে বোতলে মুখ লাগিয়ে এক ঢোক খেয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নেয়। রুমী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, সে আগে কখনো কাউকে মদ খেতে দেখেনি।

তোমরা কারা?

রুমীর প্রশ্ন শুনে ইভা কেমন যেন একটু চমকে ওঠে। উত্তর দেবে, রুমী আশা করেনি। কিন্তু ইভা বোতলটা হাতে নিয়ে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে ওর প্রশ্নের উত্তর দেয়, আমরা ডেভিল বা শয়তানের উপাসক। ইংরেজীতে আমাদের বলে উইচ। বাংলায় ডাইনী। কিন্তু ডাইনী কথাটা আমার একেবারে পছন্দ হয় না, আমাকে কি ডাইনীর মতো দেখায়?

রুমীকে স্বীকার করতেই হয় ইভাকে ডাইনীর মতো দেখায় না।

কখনো ব্ল্যাক আর্টের নাম শুনেছ?

রুমী মাথা নাড়ে, না।

ব্ল্যাক আর্ট হচ্ছে...

ইভার কাছে পরের এক ঘন্টা রুমী আশ্চর্য এক জগতের খবর শুনলো।

মানুষ একই সাথে ঈশ্বর এবং শয়তানের অস্তিত্বের সাথে পরিচিত হয়েছিল। বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু এর উল্টোটাও হতে পারতো, সৌভাগ্যবশতঃ হয়নি, হয়তো সেটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু ঈশ্বরের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে শয়তানের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে সেরকম মানুষ একেবারে নেই তা সত্যি নয়। ষোড়শ

www.MurchOna.com

শতাব্দীর দিকে সারা ইউরোপ এ ধরনের মানুষে ছেয়ে গিয়েছিল। তাদের এই শয়তান বা ডেভিলের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার এবং তার উপাসনা করার বিভিন্ন পদ্ধতিকে বলে ব্ল্যাক আর্ট বা ব্ল্যাক ম্যাজিক। সাধারণ সমাজ কখনো এদের ভালো চোখে দেখেনি, দেখার কথাও নয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে-সব নীতি এবং বিশ্বাস নিয়ে গড়ে উঠেছে সে-সব কিছুকে অস্বীকার করে এরা অদ্ভুত একটা বিকৃত ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকে। শুধু ধর্ম নয়, সত্য-ন্যায় এবং যে-কোনো ভালো জিনিসের সাথে এদের যুদ্ধ। শয়তানের প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়ার পর শয়তান এদের অনেক আশ্চর্য ক্ষমতা দিতে পারে বলে এরা বিশ্বাস করে। এর জন্যে এরা এমন কোনো বিকৃত কাজ নেই যা করতে পারে না। এদের নানা ধরনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, বিশেষ করে ধর্মের বিরুদ্ধে লেগে থাকার জন্যে ধর্মযাজকরা খুব খেপে উঠে এদের ধরে পুড়িয়ে মারা শুরু করে। সেই সময়ে সারা ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের হাজার হাজার শয়তান উপাসক নরনারীকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হয়। অনেক নির্দোষ মানুষ যে মারা যায়নি তা নয়, কিন্তু এদের সংখ্যা সত্যিই কমে গিয়েছিল।

বহুকাল পরে বিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন অনেক কিছু সহ্য করতে শিখেছে এরা আবার তখন আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা নিষিদ্ধ কৌতূহল, খানিকটা বিশ্বাস, খানিকটা লোভ নিয়ে অনেকে আবার সেই পুরাতন শয়তান উপাসনায় ফিরে গিয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে জাতি-দ্বেষ, নাৎসীবাদ, সমকাম কোনো কিছুই আর বেআইনী নয়, তাই শয়তান উপাসনাতে আপত্তি কিসের? আগের মতো এটা আর ছড়িয়ে পড়বে না কারণ পাশ্চাত্যের লোকজন এখন পুরোপুরি পার্থিব জগতের বাসিন্দা। উপাসনাতে—তা ঈশ্বরেরই হোক আর শয়তানেরই হোক তারা আর উৎসাহী নয়। শুধু উপাসনা নয়, তারা কোনো ব্যাপারেই পার্থিব জগতের বাইরে যেতে চায় না। এদেশের খেটে খাওয়া একজন চাষীর যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক জগৎ রয়েছে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে শিক্ষিত লোকটিও তা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না।

ইভা এবং তাদের দলের কিছু লোকজন আমেরিকা এবং ইউরোপ থেকে শয়তানের উপাসনা শিখে এসেছে। পাশ্চাত্যের শয়তান বা ডেভিলের উপাসক আর এদেশের প্রেত সাধক কাপালিকেরা মিলে এরা নতুন ধরনের ব্ল্যাক আর্ট শুরু করার চেষ্টা করছে। বছর দুয়েক হলো ওরা এখানে সেখানে শয়তান উপাসনার অনুষ্ঠান শুরু করেছে। চেষ্টা করলে শয়তান বা ডেভিলকেও অনুষ্ঠানে হাজির করা যায়, কিন্তু তার জন্যে বিশেষ গুণসম্পন্ন একটা মানুষ দরকার, সেই ধরনের মানুষকে ওরা মিডিয়াম বলে। গত ছয়মাস থেকে জোয়ারদার হাত দেখার ভান করে মিডিয়াম খুঁজে যাচ্ছিল। একটা মোটামুটি ভালো মিডিয়াম পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু রুমী তার থেকে অনেক ভালো, ওর হাতে নাকি তার স্পষ্ট চিহ্ন আছে। সেজন্যেই রুমীকে এভাবে ধরে এনেছে, এমনিতে সে কখনোই রাজি হতো না।

ইভা রুমীকে বারবার বোঝালো, এতে কোনো ভয় নেই, রুমী কিছু জানতেও পারবে না, প্ল্যানচেট করে আত্মা আনার মতো ব্যাপার। রুমীর বিশ্বাস হয়নি, সব শুনে ওর আত্মা শুকিয়ে গেছে।

ইভা বলেছে সাধারণ লোকজন কখনো তাদের কাজকর্ম ভালো চোখে দেখে না বলে তারা মফঃস্বলের এই নির্জন জায়গায় চলে এসেছে। আজ রাতে অমাবস্যা, রাত বারোটার পর তাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। সব মিলিয়ে তেরোজন, রুমীকে নিয়ে চোদ্দ। এক জোড়া স্বামী–স্ত্রী তাদের শিশু সন্তানকে নিয়ে আসবে শয়তানের কাছে উৎসর্গ করার জন্যে। তারা স্বামী-স্ত্রী এই ধরনের ধারণায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু সমাজে থাকতে হয় বলে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। সাধারণ মানুষজন সবাই জানে জোয়ারদার তার স্বামী, কিন্তু ইভার সাথে জোয়ারদারের কোনো সম্পর্ক নেই।

অনুষ্ঠান বেশ লম্বা। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হলে সবাইকে গায়ে বিশেষ এক ধরনের তেল জাতীয় জিনিস মাখতে হয়। আজ সারাদিন ধরে সেটা তৈরি হচ্ছে। খাওয়ার জন্যে রয়েছে বিশেষ এক ধরনের পানীয়, তাতে অ্যালকোহল ছাড়াও আরও অনেক কিছু মেশানো হয়। তাদের এই অনুষ্ঠানে গায়ে কোনো কাপড় না রেখে যোগ দেয়ার কথা, কিন্তু যারা বিদেশে যায়নি তাদের লজ্জা একটু বেশি বলে অনেক সময়ে একটু কাপড় পরে থাকে। ইভার কাছে কেন যেন এই ব্যাপারটা খুব কৌতুককর মনে হওয়াতে সে খিল খিল করে হাসতে শুরু করে। তার সুন্দর মুখে এই মিষ্টি হাসি দেখে কে তাকে কোনো কিছুতে সন্দেহ করবে? হাসি থামিয়ে ইভা রুমীকে অভয় দেয়, তাকে কাপড়ছাড়া থাকতে হবে না, সে তো আর তাদের দলের কেউ নয়—সে হচ্ছে মিডিয়াম। আর গায়ে অবশ্যি সেই বিশেষ তেলটি মাখতে হবে আর সেই পানীয়টা তাকেও খেতে হবে। পানীয়টা নাকি খুব সুস্বাদু, খেতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। রুমী ওদের মাঝখানে বসে থাকবে, সময় হলে ডেভিল তার উপরে ভর করে অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। সারারাত ধরে অনুষ্ঠান চলার পর ভোর রাতে ওরা ঘুমাতে যাবে। তখন রুমীর কাজ শেষ, সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে।

ওর কাজ শেষ হলে ও যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে কথাটা রুমী প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিল, মানুষ সবসময়েই ভালো জিনিসটা বিশ্বাস করতে চায়, দৈনন্দিন জীবনে সেটা একটা আশীর্বাদের মতই। কিন্তু অঘটনের আগে মানুষ যে সব খারাপ ব্যাপার ঘটতে পারে সেগুলি ইচ্ছা করে না দেখার ভান করে বলেই এতে অঘটন ঘটে। এই সত্যটা রুমী সবসময় মনে রেখেছে, এবারেও সে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বুঝতে পারলো আসলে এরা তাকে ছেড়ে দেবে না। অন্য কোনো কারণে না হোক, সে ঘরে একটা শিশুর মৃতদেহ দেখেছে, তার সামনে আজ রাতে আরেকটা শিশুকে উৎসর্গের নামে হত্যা করা হবে, এই দুই ঘটনার সাক্ষীকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা কিছুতেই নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে না। এদের কোনো কোমল অনুভূতি নেই, কাজ শেষ হওয়ার পর তাকে ওরা অবলীলায় হত্যা করবে।

মৃত্যু ভয়ের চেয়ে বড় ভয় কিছু নেই, রুমী পায়ে দাঁড়ানোর জোর পাচ্ছে না। বিছানায় বসে দরদর করে ঘামতে শুরু করে। কোনো কিছু চিন্তা করতে পারছে না সে। ছাড়াছাড়া ভাবে ছেলেবেলার ঘটনা, বন্ধুদের চেহারা, শানুর কথা, বহুকাল আগে শোনা মায়ের গলার স্বর এইসব মনে হতে থাকে ওর। রুমী প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত করতে। তাকে মেরে ফেলবেই, এটা কোনো অবধারিত সত্য নয়, কাজেই ওকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কত মানুষ আরও কত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, কাজেই ওর কোনো আশা

www.MurchOna.com

নেই এটা ঠিক নয়। রুমী ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে বসে। ওর বারবার মনে হয় এটা বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন, এক্ষুণি ঘুম ভেঙে দেখবে ঘরে তার পরিচিত বিছানায় শুয়ে আছে।

কিন্তু এটা দুঃস্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন থেকে অনেক ভয়াবহ, সেটা বুঝলো অনেক পরে।

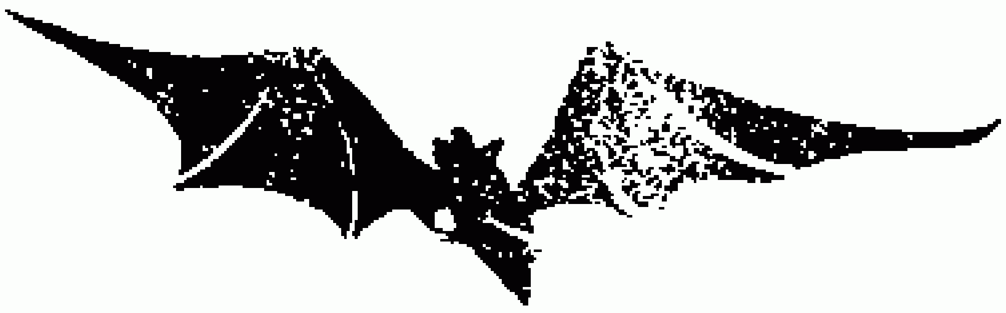

চার

রাত ঠিক বারোটা বেজেছে। রুমী উঁচু একটা জায়গায় কালো কাপড়ে ঢাকা একটা চেয়ারে বসে আছে। অদ্ভুত একটা কালো। আলখাল্লা পরানো হয়েছে তাকে, মাথায় কালো লম্বা সুঁচালো একটা টুপি। টুপির দুপাশে শিঙের মতো খানিকটা বের হয়ে আছে। আলখাল্লার বুকে সাদা চাকার মতো কি যেন আঁকা, তাতে নানারকম উদ্ভট চিহ্ন। ইভা, আরও দুটি মেয়ে এবং একজন নির্লজ্জা বুড়ী তার সারা গায়ে খুব ভালো করে সেই বিশেষ লাল রঙের তেলটি মাখিয়েছে। ইভার কাছে শোনার পর থেকে রুমীর সন্দেহ হচ্ছিল যে এই তেলটিতে কোন ধরনের ওষুধ থাকতে পারে যা তার লোমকূপের ভিতর দিয়ে শরীরে ঢুকে তাকে নেশাগ্রস্তের মতো করে ফেলবে। সেটা যতটুকু সম্ভব বন্ধ করার জন্যে সে তার বুকে পিঠে আর মুখে ধুলোবালি আর দুপুরের অবশিষ্ট খাবারের মাখনটুকু মেখে নিয়েছে। তাতে কোনো লাভ হয়েছে কিনা বলা কঠিন কারণ তেলটুকু মাখানোর পর থেকে তার সারা শরীর আগুনের মতো গরম হয়ে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠছে। শুধু তাই নয় তার প্রচণ্ড ভয়টুকু কমে গিয়ে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে একটু একটু খুশি খুশি লাগা শুরু হয়েছে। সারাক্ষণ গ্লাসে করে তাকে কি একটা খেতে দিচ্ছে, খেতে সেটা সত্যিই খুব ভালো। রুমী সেটা ঠোঁটে লাগিয়ে খাওয়ার ভান করে সাবধানে নিজের আলখাল্লায় ঢেলে ফেলছে। কালো আলখাল্লা ভিজে গেলেও বোঝা যায় না, তাছাড়া জায়গাটা বেশ অন্ধকার, আলো বলতে মশালের মতো বড় একটা মোমবাতি, একটি করোটির উপর সেটা বসানো। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে বলে এই আলোতে বেশ দেখা যায়। রুমীর পায়ের কাছে তাকে পিছন দিয়ে একটা বৃদ্ধ লোক হাঁটু মুড়ে বসে আছে। তার সামনে একে একে এগারোজন নর-নারী এসে গায়ে গায়ে ঘেঁষে চুপ করে বসে আছে। একপাশে মাটিতে একটা শিশু ঘুমিয়ে আছে, সকাল থেকেই তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাখা হয়েছে। একে উৎসর্গ করার নামে হত্যা করা হবে ভেবে একটু পর পরই রুমীর সারা শরীর শিউরে উঠছে।

কোনো কথাবার্তা নেই, শুধু মোমবাতির শিখাটি একটু একটু শব্দ করে পুড়ছে। মোম গলে করোটির একটা চোখ প্রায় বুজে গিয়েছে। দূরে কোথাও প্রথমে একটা তারপর অনেকগুলি শেয়াল ডেকে উঠলো, তাই শুনে হঠাৎ রুমীর বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো।

বৃদ্ধ লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি পড়তে শুরু করে দিল, হঠাৎ শুনলে মনে হয় খিস্তি করছে। আসলেও তাই। ঈশ্বরকে, সকল ধর্মকে, সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে, পৃথিবীতে যা কিছু ভালো আছে সবকিছুকে অভিশাপ দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়। বৃদ্ধের সাথে গলা মিলিয়ে অন্যেরাও বিড়বিড় করে কি সব বলতে শুরু করে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো বেশ অনেকক্ষণ চললো এই রকম। এক সময় সবাই থেমে পড়লে বৃদ্ধটি কেশে গলা পরিষ্কার করে অনেকটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলা শুরু করে। প্রথমে সে সবাইকে ধন্যবাদ দেয় এখানে আসার জন্যে, তারপর তারা যে কত ভাগ্যবান সে নিয়ে একটু বিস্ময় প্রকাশ করে। নতুন যারা এসেছে তারা যদিও সবারই পরিচিত তবু তাদের আবারও আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। তারা উঠে এসে বৃদ্ধটির যে জায়গায় মুখ লাগিয়ে চুমু খাওয়ার ভান করলো সেটি না দেখলে রুমী কখনো বিশ্বাস

www.MurchOna.com

করতো না। একজন একজন করে সবাই স্পষ্ট ভাষায় বললো তারা নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছে। তারা সজ্ঞানে এখন থেকে খোদার উপর থেকে বিশ্বাস সরিয়ে শয়তান বা প্রেতকে নিজেদের ভবিষ্যতের প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছে। এরপর প্রত্যেককেই দুই-তিন মিনিট করে সময় দেয়া হলো কিছু বলার জন্যে। তারা প্রথমে এখন পর্যন্ত কি কি অসামাজিক কাজ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ঈশ্বর, সমাজ এবং ধর্মকে এমন জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে দিল যে তাদের থামানো মুশকিল হয়ে পড়লো। এরপর এদের প্রত্যেকের নাম পাল্টে নতুন নাম দেয়া হলো। এখন থেকে নিজেদের মাঝে তারা এই নামেই পরিচিত হবে। একজনের নাম 'মড়াখাগী', একজন 'রক্তচোষা' অন্যগুলি এত অশ্লীল যে মুখে উচ্চারণ করা যায় না।

দলের নতুন সভ্যেরা বৃদ্ধটির সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। বৃদ্ধটি আবার বক্তৃতার মতো শুরু করে, আমাদের সাথে আজকে আরও পাঁচজন এসে যোগ দিতে পেরেছে এজন্যে আমরা সবাই আনন্দিত। আজকে এ জন্যে অনেক রকম আনন্দের ব্যবস্থা আছে। অনুষ্ঠান শুরু করার আগে তোমাদের, নতুন পাঁচজনের প্রভু শয়তানের কাছে সারা জীবনের জন্যে অঙ্গীকার লিখে দিতে হবে। প্রভু তাহলে তোমাদেরকেও নিজের কাছে টেনে নেবেন। তোমাদের ভাগ্য আমাদের ভাগ্য থেকে অনেক ভালো, অঙ্গীকারে আজকে স্বয়ং প্রভু শয়তান নিজে এসে স্বাক্ষর করবেন। এই সময় সবাই ঘুরে রুমীর দিকে তাকায়, রুমী অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসে।

বৃদ্ধটি কোথা থেকে কাগজ বের করে পাঁচজনের হাতে দিয়ে ইংরেজীতে বলে দিতে থাকে কি লিখতে হবে। মোমবাতির কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ওরা লিখতে শুরু করে। একজন ইংরেজী জানে না বলে তাকে বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হলো। প্রভু শয়তানের স্পষ্টতঃই ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সবাই লিখলো যে ওরা প্রতিজ্ঞা করছে আজীবনের জন্যে সবাই প্রভু শয়তানের দাসত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে। তার বিনিময়ে প্রভু শয়তান তাদের ঈশ্বরের কোপানল থেকে রক্ষা করবেন এবং নিজের কাছে টেনে নিয়ে তার প্রচণ্ড ক্ষমতার একটা ক্ষুদ্র অংশ তার মাঝে সঞ্চারিত করে দেবেন। সবাই স্পষ্ট করে লিখলো যদি তারা কোনভাবে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে প্রভু শয়তান তার এবং তার বংশধরের আত্মাকে ইহকাল ও পরকালে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নিপীড়ন করতে পারেন।

অঙ্গীকার লেখা শেষ হবার পর ওরা সুঁচ দিয়ে আঙুল ফুটিয়ে রক্ত বের করে সাবধানে কাগজের নিচে স্বাক্ষর করে। বৃদ্ধটি সবার হাত থেকে কাগজগুলি নিয়ে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে বললো, প্রভু শয়তান অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করে তাদের শরীরে একটা চিহ্ন দিয়ে দেবেন, এরপর থেকে তারা পুরোপুরি নিজেদের লোক হিসেবে গণ্য হবে।

বৃদ্ধ লোকটি কি বলতেই সবাই উঠে দাঁড়ায়। একজনকে, দেখে ঠিক চেনা যায় না কিন্তু রুমীর মনে হলো জোয়ারদারই হবে, একটু সরে গিয়ে কি একটা যেন চালিয়ে দিয়ে গেল। একটু পরেই আস্তে আস্তে ঢাকের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। গমগমে অদ্ভুত একটা শব্দ, কখনো সামনে কখনো পিছনে আবার কখনো ডান পাশ আর বাম পাশ থেকে শব্দ ভেসে আসছে। রুমী স্পীকারগুলি দেখার চেষ্টা করে কিন্তু অন্ধকারে দেখা যায় না। ঢাকের শব্দ এত জীবন্ত যে রুমীর মনে হতে থাকে ভালো করে তাকালে দেখবে ওকে ঘিরে আদিবাসীরা নাচের তালে তালে ঢাক বাজিয়ে চলছে। অদ্ভুত রহস্যময় ঢাকের শব্দ,

www.MurchOna.com

বুকের ভিতরে যে আদিম অনুভূতি লুকিয়ে রয়েছে সেটা টেনে বের করে নিয়ে আসতে চায়। রুমীর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

সবাই নিজেদের গ্লাস ভর্তি করে নিয়ে সেই সুস্বাদু পানীয়টুকু খেতে শুরু করে। ঢাকের শব্দের তালে তালে সবাই মেঝেতে পা ঠুকছে, ওদের মাথা দুলছে, কেউ কেউ আবার তালে তালে হাত দোলাচ্ছে। আস্তে আস্তে সবাই একজন আরেকজনের পিছনে দাঁড়িয়ে লম্বা সারি করে রুমীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। ঢাকের শব্দের তালে তালে ওদের পা পড়ছে, হাত নড়ছে, মাথা দুলছে। বৃদ্ধ লোকটি হাত থেকে কি যেন ছুঁড়ে দিল আগুনে, দপ্ করে বড় একটা শিখা জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল, আর সাথে সাথে সারা ঘর অদ্ভুত একটা গন্ধে ভরে গেল, মাতৃগর্ভে বুঝি এরকম গন্ধ থাকে।

রুমীর আশ্চর্য এক অনুভূতি হচ্ছে, সবকিছুকে মনে হচ্ছে অবাস্তব ঘোরের মতো। হাত পা হঠাৎ করে ওর শিথিল হয়ে ওঠে, পরমুহূর্তে আবার টান টান হয়ে উঠতে চায়। মনে হতে থাকে ওর পা দুটি যেন পিছন দিকে ঘুরে যেতে চাইছে। মাথাটা কেন জানি বুকের উপর ঝুঁকে পড়তে চায়, ও চেষ্টা করেও সোজা রাখতে পারে না। ঠোঁট, গলা শুকিয়ে ওর প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেতে থাকে, হাতের গ্লাসের পানীয়টুকু ঢক্ ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে শেষ করেও তৃষ্ণা কমে না, বুকটা শুকনো মরুভূমির মতো মনে হয়।

ঢাকের শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে। ওকে ঘিরে সবাই তখন আরও দ্রুত ঘুরে চলেছে, নাচের ভঙ্গিতে হাত-পা নড়ছে, মাথা দুলছে, দেহ নড়ছে। সাপের মতো এঁকেবেঁকে সবাই আদিম উল্লাসে ঘুরে চলেছে। একে একে ওদের দেহ থেকে কাপড় খসে পড়ে। মোমবাতির ম্লান আলোতে ওদের ঘর্মাক্ত নগ্ন দেহ চকচক করতে থাকে। ঢাকের দ্রুত লয়ের শব্দের সাথে সাথে ওদের অঙ্গভঙ্গি অশ্লীল হতে শুরু করে, ওরা যেন মানুষ নয়, বোধশক্তিহীন কিছু হিংস্র পশু। নাচতে নাচতে ওরা আহত পশুর মতো দুর্বোধ্য শব্দ করতে থাকে, দেহ দুলিয়ে হাত নেড়ে ওরা রুমীকে আহ্বান করতে থাকে নিজেদের দিকে।

নিজের ভিতর অদ্ভুত একটা পরিবর্তন টের পায় রুমী। ওর হাত পা যেন অনেক বড় বড় হয়ে গেছে, শরীর থেকে খুলে বেরিয়ে যেতে চায়। সমস্ত শরীরে যেন কাঁটা ফুটছে, সেই সাথে কুলকুল করে ঘামছে সে। প্রচণ্ড গরমে ওর দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়, জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকে রুমী, তবু কিছুতেই যেন ও বুক ভরে শ্বাস নিতে পারে না। মুখ খুলে গিয়ে দাঁত বের হয়ে পড়ে হাসির ভঙ্গিতে, চোখ বড় বড় করে তাকায়। মাথাটা ঘুরে যেতে থাকে অদ্ভুত ভাবে কখনো ডান দিকে, কখনো বাম দিকে—চেষ্টা করেও সোজা রাখতে পারে না। ঢাকের শব্দ দ্রুত লয়ে বেজে চলেছে, ওকে ঘিরে সবাই পাগলের মতো নাচছে, মুখে চিৎকার করে বলছে, আয়-আয়-আয়রে। আয়-আয়-আয়রে।।

রুমীর ভিতরে বহুদূর থেকে কে যেন বলতে থাকে, আসছি, আমি আসছি! ওর চেতনা আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মোমবাতির আলোতে আদিম উল্লাসে নৃত্যরত উলঙ্গ নর-নারী ওর চোখের সামনে আবছা হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে। কুৎসিত একটা মুখ সে দেখতে পায়, বীভৎস তার চেহারা। সে মানুষ নয় কিন্তু মানুষের মতো, সে কোনো পশু নয় কিন্তু পশুর মতো। লাল সরু একটা জিভ একবার বের হচ্ছে একবার বড় মুখের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। চোখ দুটি নির্বোধ ছাগলের চোখের মতো নিষ্প্রভ, একদৃষ্টে সে রুমীর

www.MurchOna.com

দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভয় পেল রুমী, ভয়, প্রচণ্ড ভয়। এ ভয়ের কোনো সীমা নেই, শেষ নেই। জীবন শেষ হয়ে গেলেও এই ভয় রক্তের মাঝে রয়ে যায়, যুগ যুগ ধরে রক্তের ভেতর দিয়ে এই ভয় বংশধরের মাঝে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

চিৎকার করে ওঠে রুমী, যত জোরে সম্ভব, ওর গলার শিরা বুঝি ছিঁড়ে যাবে, তবু থামতে পারে না সে।

কানের কাছে কে যেন বললো, লুসিফার! লুসিফার!!

আর কিছু মনে নেই রুমীর।

ভাগ্যিস মনে নেই। অন্য সবকিছু ছেড়ে দিলেও চোদ্দ মাসের যে শিশুটিকে নিজের বাবা মায়ের হাতে এক অন্ধকার জগতের উপাসনায় প্রাণ দিতে হলো সে-ঘটনাটি নিজের চোখে দেখতে হলো না। রুমী কোনদিন জানতেও পারবে না শিশুটির রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে সে যখন খনখনে গলায় অট্টহাসি দিয়ে উঠেছিল, শয়তানের উপাসক ঐ বারোজন নর-নারী পর্যন্ত আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল। কিন্তু রুমীর কিছু মনে নেই।

রুমীর খুব ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এসেছে। ওর নিজেকে প্রচণ্ড জ্বরে বিকারগ্রস্তের মতো মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ লাগলো ওর সবকিছু মনে করতে। ওর ইচ্ছে করছিল আবার অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু বুকের ভিতর কে যেন তাকে জোর করে জাগিয়ে রাখলো। বারবার কে যেন মনে করিয়ে দিতে থাকে ঃ ওকে বাঁচতে হবে, আর বাঁচতে হলে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। বারবার ওর বোধশক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছিল, 'যা হয় হোক' এই ধরনের একটা অনুভূতি ওকে দখল করে নিতে চাইছিল, কিন্তু জোর করে সে নিজেকে জাগিয়ে রাখলো। সাবধানে চোখ খুলে তাকিয়ে পরিবেশটা বুঝতে চেষ্টা করলো সে।

একটা বিছানায় শুয়ে আছে রুমী। ও একা নয়, ওকে জড়িয়ে ধরে ওর পাশে আরও কেউ শুয়ে আছে, ওর বুকের ওপর তার একটা হাত। সাবধানে সে হাতটা সরিয়ে দিয়ে মানুষটাকে দেখতে চেষ্টা করে, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু রুমী বুঝতে পারে ঃ একটি মেয়ে। রুমী আস্তে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড ব্যথায় ওর মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইলো। শব্দ করবে না করবে না করেও গলা দিয়ে ব্যথার একটা আর্তধ্বনি বের হয়ে গেল। পাশে শুয়ে থাকা মেয়েটি ঘুমের ঘোরে কি একটা বলে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে, গলার স্বরে মেয়েটিকে চিনতে পারে রুমী, ইভা। কিন্তু এ নিয়ে রুমীর এখন বিস্মিত হওয়ার মতো অবস্থা নেই। সাবধানে সে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে দাঁড়ায়, মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো অবস্থা তার, কোনমতে একটু স্থির হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, অন্ধকারেও জায়গাটি বেশ বোঝা যাচ্ছে। শব্দ না করে ছিটকিনি খুলে সে বের হয়ে আসে, একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ওর সারা শরীর জুড়িয়ে দেয় সাথে সাথে। বাইরে অন্ধকার রাত, পরিষ্কার আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ঝক্ঝক্ করছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে। ও নক্ষত্র চেনে না, চিনলে বলতে পারতো এখন ভোর রাত চারটা। রুমী সাবধানে বারান্দা দিয়ে হেঁটে উঠনে নেমে পড়ে। ঘেউ ঘেউ করে একটা কুকুর ডেকে উঠলো কোথাও, রুমী ভ্রূক্ষেপ না করে দৌড়ানোর চেষ্টা করে। একটা বিরাট মাঠের মতো ফাঁকা জায়গা, দূরে উঁচু সড়ক আবছা বোঝা যায়। রুমী সেদিকে ছুটতে থাকে। খালি পায়ে হাঁটার

অভ্যাস নেই অনেকদিন, লম্বা আলখাল্লা পায়ে জড়িয়ে যায়, প্রতি পদক্ষেপে ওর মাথা প্রচণ্ড ব্যথায় শরীর থেকে ছিঁড়ে পড়তে চায়, কিন্তু রুমীর কিছু করার নেই। দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটতে থাকে ও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর এখান থেকে সরে পড়তে হবে। মাঠটা পার হয়ে উঁচু সড়কে উঠে ও পিছন ফিরে তাকায়, দূরে ঐ ভূতুড়ে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা দুটি তাল গাছ বাড়ির পিছনে, এখান থেকে আবছা আবছা দেখা যায়। জায়গাটা চিনে রাখতে পারলে হতো, কিন্তু রুমীর এখন থামার সাহস নেই। সে রাস্তা ধরে ছুটতে থাকে, চেষ্টা করে মনে রাখতে রাস্তায় কি পড়ছে। কোনো লোকালয় নেই, একটা গোরস্থান, বহুদূর ফাঁকা রাস্তা তারপর একটা বড় বটগাছ আবার ফাঁকা রাস্তা, রুমী প্রাণপণে ছুটতে থাকে। ওর গায়ে জোর নেই, পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে, প্রচণ্ড ব্যথায় মাথা ছিঁড়ে পড়তে চাচ্ছে কিন্তু তবু সে থামে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে পারলে বাঁচে।

স্থানীয় থানায় পৌঁছলো রুমী ঘন্টাখানেক পরে। পথে ছোট একটা দোকান পেয়ে সে দোকানিকে ডেকে তুলেছে। দোকানি দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে এই অদ্ভুত পোশাকে এরকম অবস্থায় দেখে প্রথমে কিছুতেই ঝাঁপ খুলতে চায় না। রুমী অনেক কষ্ট করে বুঝিয়েছে নিজের অবস্থা, তখন দোকানি পৌঁছে দিয়েছে ওকে থানায়।

থানার বৃদ্ধ এস. আই. কিছুতেই রুমীর কথা বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। চোখ লাল, কথাবার্তা অসংলগ্ন, শরীর থেকে পরিষ্কার মদের গন্ধ বের হচ্ছে, কম বয়সী নষ্ট হয়ে যাওয়া ছেলে তিনি আগেও অনেক দেখেছেন। এর কথা বিশ্বাস করে এখন কে যাবে ভূতের সাধনা দেখত? গায়ের লাল রং আর অদ্ভুত আলখাল্লাটি দেখে অবশ্যি কেমন যেন একটু সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু তবুও তিনি ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করাই স্থির করলেন। রুমীকে রাতটা লক-আপে রাখতে বলে তিনি গেলেন অজু করতেন, ফজরের আজান পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে।

রুমীর কথা পুলিসের বিশ্বাস না হওয়ায় তার খুব আশা ভঙ্গ হলো। এতক্ষণ যে শক্তিটি তাকে চালিয়ে এনেছে সেটি এখন ফুরিয়ে গেছে। বসে থাকার ক্ষমতা নেই। ওকে নিয়ে হাজতে রাখবে রাতটা, কিন্তু তাতে ওর কিছু আসে যায় না। ও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো একটা বেঞ্চের উপর। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে, শরীরটা কাঁপছে অল্প অল্প। চোখ ভেঙে ঘুম আসছিল ওর, অচেতন হয়ে পড়ছিল সে। হঠাৎ রুমীর চোখ বিস্ফারিত হয়ে খুলে যায়—ও স্পষ্ট দেখতে পায় সেই বীভৎস কুৎসিত মুখটি ওর মুখের উপর ঝুঁকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, লাল জিভটি বারবার লক লক করে বের হয়ে আসছে মুখ থেকে। ছাগলের চোখের মতো দুটি স্থির চোখ সোজা ওর দিকে তাকিয়ে। রুমীর সারা শরীর কুঁকড়ে গেল ভয়ে, চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে উঠলো সে, অমানুষিক সে চিৎকার। চিৎকার বন্ধ করতে পারে না রুমী, দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় ওর, একসময় গল গল করে রক্ত বের হয়ে আসে ওর গলা দিয়ে। বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় সে, প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে বেঞ্চের তলায় অন্ধকারে ঢুকে পড়তে।

বৃদ্ধ এস. আই. অজু শেষ না করেই ছুটে এলেন ভিতরে, রুমীর উপর ঝুঁকে পড়ে ভয় পাওয়া গলায় ডাকলেন তাকে, এই ছেলে, এই ছেলে, কি হয়েছে তোমার?

www.MurchOna.com

আস্তে আস্তে রুমীর সারা শরীর শিথিল হয়ে আসে, সে মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়ে থাকে স্থির হয়ে। বৃদ্ধ এস. আই. ওকে টেনে বের করলেন বেঞ্চের তলা থেকে, মাথাটা ঘুরে গেছে অদ্ভুতভাবে, টেনে সোজা করার চেষ্টা করলেন তিনি। আস্তে আস্তে চোখ খুলে গেল রুমীর, আশ্চর্য স্থির একটা দৃষ্টি তার চোখে। সে-দৃষ্টি বৃদ্ধ এস. আইয়ের চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে তার হৃৎপিণ্ড যেন টেনেছিঁড়ে বাইরে নিয়ে এলো। আতঙ্কে শিউরে উঠে লাফিয়ে পিছিয়ে গেলেন তিনি, ইয়া আল্লাহ্! কাঁপা গলায় আয়তুল কুরসী পড়তে লাগলেন বুকে হাত দিয়ে।

খনখনে গলায় অট্টহাসি হেসে ওঠে রুমী, ওর গলা দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে আবার। বৃদ্ধ এস. আই.-এর মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে গেল, হাত বাড়িয়ে একটা টেবিল ধরে কোনমতে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ইদরিস মিয়া তাড়াতাড়ি দশজনকে বলো রাইফেল নিয়ে তৈরি হতে। ড্রাইভারকে ডেকে তোলো—জলদি!

থানার মেঝেতে শুয়ে অট্টহাসি হাসতে থাকে রুমী, কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। হাসপাতালে খবর দেয়া হয়েছে, লোকজন ওকে নিতে আসছে। বৃদ্ধ এস. আই. দশজন সশস্ত্র পুলিসকে পুরোনো একটা জীপে গাদাগাদি করে তুলে সেই ভূতুড়ে বাড়িটি ঘিরে ফেললেন ভোর রাতেই।

ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গেল তাঁর বহুদিন পর।

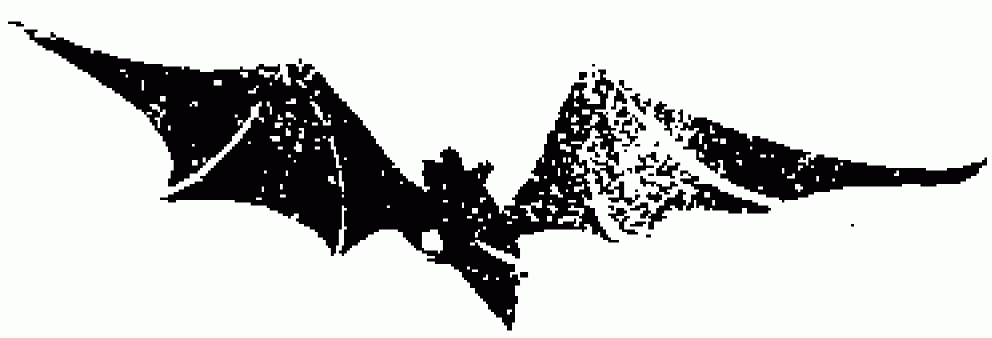

www.MurchOna.com

পাঁচ

কিবরিয়া ভাইয়ের অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস, তাই সাত সকালে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে খুব বিরক্ত হলেন তিনি। নিশ্চয়ই খবরের কাগজের ছেলেটা টাকা নিতে এসেছে, খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন চলে যাবে ভেবে, কিন্তু চলে যাবার কোন লক্ষণ নেই, কড়া নাড়া বন্ধ হয়ে বরং দরজায় লাথি মারার মতো শব্দ হতে থাকে। বাধ্য হয়ে বিছানা থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে দরজা খুলতেই তাঁর খাবি খাবার মতো অবস্থা। বাইরে পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, আপনার নাম কিবরিয়া চৌধুরী?

হুঁ। ঢোক গিলে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কি হয়েছে?

আমার সাথে যেতে হবে আপনাকে, চলুন। পুলিসটি পারলে তাঁকে সেভাবেই নিয়ে যায়।

কিবরিয়া ভাই মিন মিন করে বললেন, একটু বাথরুম থেকে...

তাড়াতাড়ি...পুলিসটা প্রায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কিবরিয়া ভাই জানালা গলে পালিয়ে যাবেন কিনা ভাবলেন। নিশ্চয়ই তাঁর ইদানীংকার রাজনীতি নিয়ে একটা কিছু হয়েছে। কেন মরতে ঐ সব উগ্র বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলেন, রাগে দুঃখে তাঁর হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।

এমনিতে তাঁর কোষ্ঠকাঠিন্যের দোষ, প্রতিদিন বাথরুমে পাকা একঘন্টা সময় লেগে যায়। ভয়ের চোটে আজ পাঁচ মিনিটেই সব সমাধা হয়ে গেল। যত্ন করে দাড়ি কামিয়ে একেবারে স্যুট টাই পরে নিলেন। ভালো কাপড় পরা থাকলে লোকজন ভালো ব্যবহার করে, সমাজ ব্যবস্থার এই জঘন্য প্রচলিত নিয়ম মানতে আজ তাঁর এতটুকু দ্বিধা হলো না।

তাঁর চকচকে পোশাক দেখে সত্যি সত্যি পুলিসটা দাঁড়িয়ে পড়ে, ভদ্রভাবে বলে, চলুন স্যার, বাইরে জীপ আছে।

জীপে ওঠার সময় কিবরিয়া ভাই দেখলেন আশেপাশে লোকজন উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে—বাড়িওয়ালা আবার একটা ঝামেলা না বাধিয়ে ছাড়বে না।

কিবরিয়া ভাইকে থানায় না নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের তিনতলা একটা কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো। বাইরে পুলিস পাহারা, ভিতরে বেশ ক'জন ডাক্তার, পুলিসের বড় বড় অফিসার। কিবরিয়া ভাইকে দেখে একজন এগিয়ে এলো, আপনি কিবরিয়া চৌধুরী?

জ্বী।

একে চেনেন আপনি?

কিবরিয়া ভাই দেখলেন বিছানায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে রুমী। মাথায় ব্যাণ্ডেজ, নাকে অক্সিজেন টিউব, হাতে স্যালাইন, বুকে হাতে কপালে নানা ধরনের মনিটর, দেখে বোঝা যায় না আদৌ বেঁচে আছে কিনা।

চেনেন একে?

চেনেন বলে কি বিপদে পড়বেন কে জানে, মিথ্যা বললে বিপদ হয়তো আরও বেড়ে যাবে। দুর্বল গলায় আমতা আমতা করে বললেন, হ্যাঁ চিনি। কেন?

পুলিস অফিসারটি সংক্ষেপে তাঁকে পুরো ব্যাপারটি খুলে বলতেই মুহূর্তে তিনি সাহস ফিরে পেলেন। সেই ভূতুড়ে বাড়িতে রুমীর ব্যাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির একটা বই পাওয়া গেছে, লাইব্রেরিতে খোঁজ করে দেখা গেছে এটি কিবরিয়া ভাই নিয়েছেন। সে-রাতের পর রুমীর আর জ্ঞান ফেরেনি, তাই তার পরিচয় জানার জন্যে কিবরিয়া ভাইকে আনা হয়েছে। রুমীকে যখন ঢাকায় আনা হয় তখন তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, নিউরো সার্জনেরা ছয় ঘন্টা অপারেশান করেছেন, তাঁরা বলেছেন এ যাত্রা সে বেঁচেও যেতে পারে। পাঁচদিন হয়ে গেছে এখনো জ্ঞান ফেরেনি, আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে হবে। কিবরিয়া ভাই রুমীর আত্মীয়স্বজনকে খবর দেয়ার ভার নিলেন। পুলিস অফিসারটি তাঁকে অনুরোধ করলেন ব্যাপারটি গোপন রাখতে, খবরের কাগজে পর্যন্ত ঘটনাটি ছাপতে দেয়া হয়নি।

রুমীর জ্ঞান ফিরলো কুড়ি দিন পর। এই কুড়ি দিন কিবরিয়া ভাই প্রেত চর্চা এবং ব্ল্যাক আর্ট সম্পর্কে দেশী-বিদেশী যতোগুলি বই পেয়েছেন সবগুলি পড়ে ফেলেছেন। যতো পড়েছেন ততো তিনি অবাক হয়েছেন এই বিংশ শতাব্দীতেও যে এ ধরনের ব্যাপারটা ঘটতে পারে তিনি নিজের চোখে রুমীর অবস্থা না দেখলে বিশ্বাস করতেন না। রুমীর জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকদিন তিনি ওকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন, শেষের দিকে ডাক্তাররা সন্দেহ করছিলেন রুমীর জ্ঞান হয়তো আর নাও ফিরে আসতে পারে, এভাবেই অনির্দিষ্টকাল অচেতন হয়ে থাকবে। তাই যেদিন রুমীর জ্ঞান ফিরে এলো সেদিন কিবরিয়া ভাইয়ের আনন্দের সীমা ছিল না, পরিচিতদের ভিতর রুমীর জন্যেই তাঁর খানিকটা স্নেহ রয়েছে।

জ্ঞান ফিরে আসার পর রুমীর মুখে পুরো ঘটনা শুনে তিনি প্রেত উপাসকদের উপর প্রচণ্ড খেপে উঠলেন। তিনি নিজেকে নাস্তিক বলে দাবি করেন কাজেই ঈশ্বর বা শয়তান যাকে খুশি প্রভু হিসেবে দাবি করায় তাঁর কিছু আসে যায় না, কিন্তু উপাসনার নামে নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করা বা নিরীহ ছেলেদের মেরে ফেলার আয়োজন করাটা মেনে নেয়া যায় না। ওদের প্রত্যেককে ফাঁসীতে না ঝোলানো পর্যন্ত তিনি শান্তি পাবেন বলে মনে হয় না। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে ওদের বিচারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেত উপাসকদের কোনো বিচার হলো না। রুমী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আগেই প্রেত উপাসকের দল ছাড়া পেয়ে গা ঢাকা দিল, কেন এমন হলো ঠিক জানা গেল না। কিবরিয়া ভাই অনেক চেষ্টা করে শুধু জানতে পারলেন, দেশের খুব একজন বড় হর্তাকর্তার ছেলে প্রেত উপাসকদের সাথে ধরা পড়েছিল, পুরো ব্যাপারটি তাই এতো তাড়াহুড়া করে চাপা দেয়া হয়েছে। ছেলেটিকে পরদিনই দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সে এখন ইংল্যাণ্ড না আমেরিকা কোথায় যেন আছে। দণ্ডমুণ্ডের মালিক একেবারে পাষণ্ড নন, রুমীর যেন ভালো চিকিৎসা হয়, এবং চিকিৎসার সব খরচ যেন সরকার বহন করে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটুকু না করলেও চলতো, কারণ কিবরিয়া ভাই খোঁজ নিয়ে জেনেছেন প্রেত উপাসকদের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী প্রমাণ নেই, রুমীর একার বক্তব্য

www.MurchOna.com

খোপে টিকবে না। সাক্ষী প্রমাণ বের করার দায়িত্ব পুলিসের কিন্তু পুলিস এ ব্যাপারে আঙুলও নাড়াবে না, বলা যেতে পারে নাড়াতে পারবে না।

পরের কয়দিন কিবরিয়া ভাই আগুন খেয়ে অঙ্গার বাহ্যি করার যন্ত্রণা বয়ে বেড়ালেন।

রুমী অনেক পাল্টে গেছে। তার মস্তিষ্কের অপারেশানের পর অনেক কিছু সে একেবারে ভুলে গেছে, মাঝে মাঝে অনেক ছোটখাটো ব্যাপার চট করে মনে করতে পারে না। একটু বেশি রাত জাগলে কিংবা কোনো ব্যাপারে একটু বেশি চাপ পড়লেই তার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হতে থাকে, কোনো পেন-কিলার দিয়ে সেটা বন্ধ করা যায় না। ডাক্তার বলেছেন আস্তে আস্তে নাকি সেরে যাবে। আজকাল সে একটু ভীতু হয়ে গেছে, একা ঘরে ঘুমোতে ভয় পায়।

সে আর কাউকে তার সে-রাত্রির অভিজ্ঞতা খুলে বলেনি। পুরো ব্যাপারটি খুঁটিনাটি সহ ডাক্তার এবং পুলিস ছাড়া শুধু কিবরিয়া ভাই শুনেছেন। ডাক্তার এবং কিবরিয়া ভাই দুজনেই তাকে বুঝিয়েছেন যে প্রেত বা শয়তান সবকিছু বাজে কথা, তার পুরো অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে কয়টি মারাত্মক ড্রাগ। তার রক্তে নাকি কোকেন পাওয়া গিয়েছিল। তাকে যে পরিমাণ ড্রাগ দেয়া হয়েছিল তাতে তার মস্তিষ্ক পাকাপাকি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারতো। কেন হয়নি সেটা একটা বিস্ময়। হতে পারে সে বুকে পিঠে কপালে মাখন লাগিয়ে নিজেকে খানিকটা রক্ষা করেছে, মদের সাথে মিশিয়ে যা খেতে দিয়েছিল সেটাই সে কম খেয়েছে। ঠিক কি হয়েছে বলা মুশকিল, কিন্তু ডাক্তার বারবার বলেছেন তার ভাগ্য খুবই ভালো।

রুমীও নিজেকে তাই বোঝায়। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থেকে ফিরে এসেছে সে। সে-রাতের পর ঐ কুৎসিত মুখটিকে লক্‌লকে জিভ বের করে এগিয়ে আসতে দেখেনি। অনেক কিছু ভুলে গেছে সে, কেন ঐ মুখটিও ভুলে গেল না ভেবে ওর খুব দুঃখ হয়। কে জানে ঐ মুখ হয়তো ভোলা যায় না, ওর স্মৃতি হয়তো রক্তে মিশে থাকে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার জন্যে।

ঠিক রুমীর গা ঘেঁষে একটা গাড়ি এসে থামে। এ ধরনের ব্যাপার ওর আগে ঘটেছে, কিন্তু রুমী কিছুতেই মনে করতে পারে না কবে কোথায় কিভাবে। গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে একটা মেয়ে ওকে ডাকে, রুমী।

সাথে সাথে রুমীর সব মনে পড়ে যায়, ইভা! রুমীর বুক ধক্ করে ওঠে। পালিয়ে যাবে সে? কিন্তু কোথায় পালাবে?

রুমী!

রুমী ইভার দিকে তাকায়, হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এই প্রকাশ্য দিনের বেলায় কি করবে ইভা? গাড়িতে আর কেউ নেই, রুমী একটু এগিয়ে যায়, কি?

কেমন আছ?

ন্যাড়া মাথায় গজানো অল্প অল্প চুল মস্তিষ্কের সেই অপারেশানের দাগ এখনো ঢাকতে পারেনি, আর তাকে কিনা জিজ্ঞেস করছে সে কেমন আছে। রুমীর ইচ্ছে হলো সে

www.MurchOna.com

শব্দ করে হেসে ওঠে, কিন্তু ওর হাসি আসতে চায় না। অবাক হয়ে সে ইভার দিকে তাকিয়ে থাকে, এ কি মানবী?

আমি কাল চলে যাচ্ছি। নিউ ইয়র্কে—রুমী চুপ করে তাকিয়ে থাকে, এত সুন্দর একটা মুখ, অথচ…

ভয় নেই, আমি আর আসবো না। মিষ্টি করে হেসে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে ওঠে, জানো? আমার বাচ্চা হবে?

রুমীর কি আসে যায় তাতে? ওকে বলছে কেন?

বাচ্চার বাবা কে জানো?

চমকে ওঠে রুমী, কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, কে?

লুসিফার। লুসিফার আর তুমি। খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে ইভা। হাসি আর থামতে চায় না কিছুতেই। হাসতে হাসতেই হাত নেড়ে গাড়ি ছেড়ে দেয় ইভা, রাজারবাগের মোড়ে ডান দিকে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে রইলো রুমী, নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেছে মেয়েটা, নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেছে! রুমীর বিশ্বাস হয় না। ওটা মেয়ে নয় ওটা রাক্ষুসী, ও সব পারে। আবার দেখা হলে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন এরকম বললো।

কিন্তু রুমীর সাথে ইভার আর কোনদিন দেখা হয়নি।

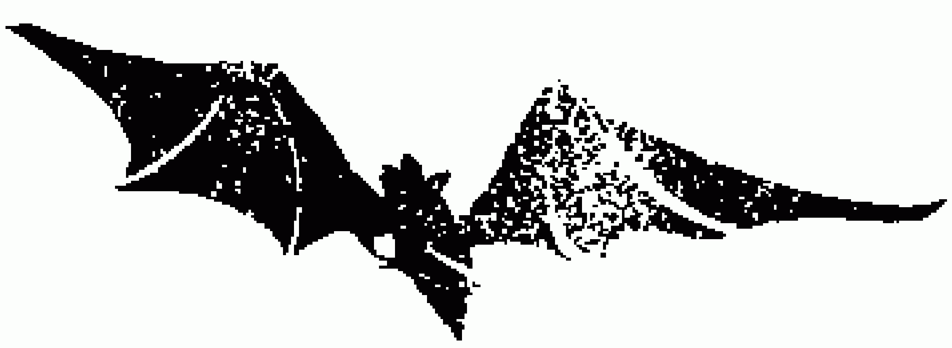

www.MurchOna.com

দ্বিতীয় অংশ
দুঃস্বপ্ন

ছয়

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে রুমীর সাথে কাজ করে আরিফ, হালকা পাতলা সুদর্শন একটা ছেলে। ভারি হাসিখুশি ছেলে আরিফ, সবসময়েই একটা না একটা কিছু নিয়ে হৈ চৈ করছে। পড়াশোনায় খুব মন নেই, সবসময়েই বলছে এ দেশে আর থাকবে না, কি আছে এই পোড়া দেশে? আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং আরও সব বিদেশী কাউন্সিলে ঘোরাঘুরি করে, বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লিখে বেড়ায়। একবার বিদেশে পৌঁছাতে পারলে নাকি বাসন মেজেই অবস্থার পরিবর্তন করে ফেলবে! খুব বড়লোকের ছেলে, "পোড়া দেশের" কোনো দুঃখ কষ্টই কখনো তাকে স্পর্শ করে না, তবু কেন বিদেশে গিয়ে বাসন মাজার এত আগ্রহ আজকাল রুমী খানিকটা বুঝতে পারে। জন্ম হবার পর থেকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এমন কি এই দেশের পত্রপত্রিকাতেও শুধু বিদেশের প্রশংসাই শুনে এসেছে, ওর দোষ কি? ওদের শুধু এদেশে জন্ম, কিন্তু ওরা এদেশের মানুষ নয়।

এ সপ্তাহের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে রুমীদের হিলিয়াম গ্যাসের স্পেকট্রাম বের করার কথা। হিলিয়াম গ্যাস ভরা ডিসচার্জ টিউবের দুই মাথায় ইনডাকশন কয়েল দিয়ে কয়েক হাজার ভোল্ট দিতে হয়, একটু সাবধানে কাজ করার কথা, হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললে প্রচণ্ড শক্ লাগে, কারেন্ট কম বলে আর কিছু হয় না। রুমী সুইচ অফ করে তার দুটি লাগাচ্ছিল, হঠাৎ তার স্পষ্ট মনে হলো আরিফ মনে মনে বলছে, দেই শালাকে একটা শক্! এত স্পষ্ট মনে মনে কথাটি শুনলো যে রুমী অবাক হয়ে ঘুরে আরিফের দিকে তাকায়, আর আরিফ সত্যি সত্যি সেই মুহূর্তে ইনডাকশন কয়েলটির সুইচ অন্ করেছে।

প্রচণ্ড একটা ইলেকট্রিক শক্ খেলো রুমী। যদিও আরিফ বারবার বললো সে খুব দুঃখিত, ভুলে সুইচটা অন্ করে ফেলেছে, কিন্তু রুমী ঠিক জানে কাজটা সে ইচ্ছা করে করেছে। আরিফের উপর ঘেন্না ধরে গেল তার।

কিন্তু কিভাবে শুনলো সে আরিফের মনের কথাটা? রুমী এত অবাক হলো যে বলার নয়।

সন্ধ্যার পর রিক্শা করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফিরে আসছিল রুমী। অনেকদিন অপেক্ষা করে একটা আবাসিক জায়গা পেয়ে সে তার ফুপুর বাসা ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল ছুটিতে রোববার বেড়াতে যায়, ফুপু গাল ফুলিয়ে বলেন ভুলেই গেলি আমাদের! বিপদের সময় তো আমিই জায়গা দিয়েছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। নির্বোধ মহিলা, রুমী কিছু মনে করে না।

বুড়ো রিকশাওয়ালার রিকশাটা টেনে নিতে জোর পরিশ্রম হচ্ছে। রিকশার বেল কাজ করছে না। তাই ছোট একটা লোহার শিক দিয়ে ঠুন ঠুন করে বেলটা ঠুকছে একটু পর পর। রুমীর একটু মায়া হলো বুড়ো রিকশাওয়ালার উপর। কে যেন বলছিল রিকশাওয়ালারা নাকি একজন কেরানীর থেকে বেশি টাকা উপার্জন করে। যে কষ্টটুকু করতে হয় ওদের,

www.MurchOna.com

তাতে প্রফেসরের থেকেও বেশি টাকা উপার্জন করা উচিত। পৃথিবীটা বড় একচোখা, কাউকে বেঁচে থাকার জন্যে এতো কষ্ট করতে হয়, আবার কেউ...

রুমীর চিন্তার স্রোত হঠাৎ থেমে গেল পিছন থেকে একটা গাড়ি ক্রমাগত হর্ন দিয়ে যাচ্ছে, খুব তাড়া নিশ্চয়ই। রিকশাওয়ালা জায়গা দিতে পাশে সঁরতে পারছে না, পাশে কাদা জমে আছে, একবার চাকা আটকে গেলে টেনে নিতে জান বেরিয়ে যাবে।

ব্যাস্টার্ড! রুমী হঠাৎ পরিষ্কার শুনলো পিছনের গাড়ির লোকটি মনে মনে রিকশাওয়ালাকে গালি দিচ্ছে। ড্যাম রিকশালাওয়ালা...এমন একটা কুৎসিত ইংরেজী শব্দ, বাংলায় এর ভালো প্রতিশব্দ পর্যন্ত নেই। রুমী অবাক হয়ে পিছনে তাকায়, হেডলাইটে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর, কিছু দেখতে পেল না।

হারামজাদা—হঠাৎ চমকে ওঠে রুমী, শালা তোমাকে দেখাচ্ছি মজা, এক ধাক্কায় যদি তোমার বাপের নাম না ভোলাই।

কিছু বোঝার আগে পাশ থেকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে রুমী রিকশা থেকে ছিটকে পড়লো মাটিতে, রিকশাওয়ালাকে নিয়ে রিকশা আরও সামনে কাত হয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমা হয়ে গেল ওদের ঘিরে। রিকশার বারোটা বেজে গিয়েছে, কিন্তু রিকশাওয়ালার বিশেষ কিছু হয়নি, হাঁটুর উপর থেকে শুধু খানিকটা ছাল উঠে গেছে। রুমীর হাতে পায়ে সামান্য কাদা লেগেছে কিন্তু কোথাও ব্যথা পায়নি। বুকটা শুধু ধক্ ধক্ করছে অনেকক্ষণ থেকে।

লোকজন গাড়িওয়ালাকে মুখ খারাপ করে গালি দিল, যদি কোনভবে ধরতে পারতো পিটিয়ে মেরে ফেলতো। যাদের গাড়ি আর পয়সা আছে আর যাদের গাড়ি বা পয়সা কিছুই নেই, দুই ভিন্ন দল। এক দলের সাথে আরেক দলের সম্পর্ক শুধু পথেঘাটে, কারো জন্যে কারো মমতা নেই।

রুমীর পকেটে বেশি টাকা ছিল না, যা ছিল তাই রিকশাওয়ালাকে দিয়ে পুলিস আসার আগেই সরে এলো। সে থেকে আর কি করবে?

হেঁটে হেঁটে ফিরে এলো রুমী। কিন্তু কি আশ্চর্য! কি পরিষ্কার শুনলো সে লোকটির কথা।

এলিফেন্ট রোড ধরে হাঁটছিল রুমী হঠাৎ ভারি অন্যমনস্ক হয়ে গেল যে, আবছা মনে হলো কে জানি বলছে ভাত খাওয়ার পয়সা নেই ওষুধ খাওয়ার শখ। কানে শোনা যায় না, কিন্তু এতো স্পষ্ট শোনার অনুভূতি যে রুমী ভীষণ চমকে ওঠে। একটা ওষুধের দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটছে সে, হতে পারে এ দোকান থেকেই কেউ বলছে। রুমী একটু এগিয়ে যায়। আধময়লা সবুজ শাড়ি পরা রোগা কমবয়সী একটি মেয়ে ওষুধ কিনছে। রুমী শুনতে পেল মেয়েটি বললো, খুব জ্বর পোলাডার। ডাক্তার সাব কইছেন চাইরডা বড়ি খাইলেই জ্বর নাইমা যাইবো।

হুঁ। ওষুধ তো জ্বর নামানোর জন্যেই। রুমী স্পষ্ট শুনলো ওষুধের দোকানের লোকটা এই বলেই থেমে গেল না, মনে মনে বললো, লাটসাহেবের পোলা অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন!

কি দিয়া খাওয়ামু? পানি দিয়া?

হুঁ। দুইটা বড়ি একবারে।

তয় ডাক্তার যে কইলো একটা কইরা?

মনে মনে অশ্লীল একটা গালি দিল লোকটা। মুখে বললো, একটা করে খাওয়াতে পারো একটু দেরি হবে জ্বর নামতে এই আর কি? দুইটা করে দিলে···

ডাক্তার সাব যে কইলো ছোড়ু পোলা একটার বেশি যেন না দেই···

লোকটা আবার মনে মনে বিশ্রী অশ্লীল একটা গালি দেয়। মুখে বললো ডাক্তাররা ঐ রকমই বলে। আমি ওষুধ বিক্রি করি আমি জানি না? এরপর মনে মনে যে কথাটি বললো তা শুনে রুমী থ হয়ে যায়, বললো, মাগী তোর এতো চিন্তা কি? তোকে টেরামাইসিন কে দিচ্ছে? অ্যাসপিরিন দিচ্ছি, দুটো করেই খাওয়া, বাঁচার হলে এমনি বাঁচবে।

রুমী আরেকটু এগিয়ে যায়। মেয়েটি বললো, কত দাম?

চোদ্দ টাকা।

কিছু কম নেন। গরীব মানুষ, ঠিকা কাম করি।

থামো থামো! টেরামাইসিনের দাম জানো? ষোলটার দাম ষোল টাকা। তোমার কাছে এমনি দুই টাকা কম নিচ্ছি। মনে মনে বললো, নেট লাভ সাড়ে তেরো টাকা, যা মাগী দুর হ, সারাদিন বিক্রি নাই।

রুমী দোকানের ভিতর ঢোকে, মেয়েটি সরে ওকে জায়গা দিল। লোকটা উৎসুক চোখে ওর মুখের দিকে তাকায়, রুমী খুব ঠাণ্ডা গলায় বললো, টেরামাইসিনের বদলে অ্যাসপিরিন দিলেন কেন?

দাড়িসহ লোকটার চোয়াল ঝুলে পড়ে অদ্ভুত একটা মাছের মতো দেখাতে লাগলো, রুমী তার জীবনে কোনো মানুষকে এতো অবাক হতে দেখেনি। লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে সামলানোর জন্যে।

নেট লাভ সাড়ে তেরো টাকা, না?

আমি···আমি···আমি···লোকটা খাবি খেতে থাকে।

মেয়েটি হাতে শক্ত করে টাকাগুলি ধরে অবাক হয়ে রুমীর দিকে তাকিয়ে ছিল। রুমী বললো, তুমি এসো আমার সাথে, ওষুধ কিনে দিই। এ তোমাকে অন্য ওষুধ দিচ্ছিল।

লোকটার অবস্থা দেখে সন্দেহের অবকাশ নেই, এতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছে যে প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত নেই। রুমী প্রেসক্রিপশনটি নিয়ে মেয়েটির হাতে দেয়।

কি চোরা, কি সর্বনাইশা চোরা, আবার দাড়ি রাখছে হারামীর বাচ্চায়—মেয়েটি সরু গলায় চিৎকার করে লোকটিকে গালি দিতে শুরু করে, অসুস্থ সন্তানের কথা চিন্তা করে মেয়েটির রাগ কিছুতেই কমতে চায় না। রুমী অনেক কষ্টে মেয়েটিকে শান্ত করে, এখন সে লোকজনের ভিড় জমাতে চায় না। অন্য একটি দোকান থেকে সে ঠিক ওষুধ কিনে দিয়ে মেয়েটিকে বিদেয় করলো।

মেয়েটি যাবার সময় বারবার বললো, সে আল্লাহর কাছে তার জন্যে দোয়া করবে, তার ভালো হবে, গরীবের দোয়া নাকি বৃথা যায় না।

ছট্‌ফট্‌ করে ঘুরে বেড়ায় রুমী, হঠাৎ হঠাৎ সে প্রায়ই আজকাল এর ওর মনের কথা শুনে ফেলছে। ভালো ভালো সব লোকজন কি ভয়ানক সব কথা বলে, মনে মনে সে অবাক

www.MurchOna.com

হয়ে যায় শুনে। কাউকে সে বিশ্বাস করে না আজকাল, পৃথিবীতে ভালো লোক নেই একটিও, সব ভণ্ড। খ্যাপার মতো হয়ে যাচ্ছিল রুমী, কোনো কিছুতে শান্তি নেই ওর। লোকজনের মনের কথা শোনার ওপর তার নিজের কোনো হাত নেই, তাহলে সে কখনোই কিছু শোনার চেষ্টা করতো না। আজকাল সে একটু আগে থেকে বুঝতে পারে কিছু একটা শুনবে, সেজন্যে ভারি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে, কোনকিছু ঠিক করে ভাবতে পারে না, অনেকটা ঠিক ঘুমিয়ে পড়ার আগের মতো অবস্থা। তার মাঝে হঠাৎ করে সে শুনতে পায় কথাটা, যেন সে নিজেই বলে ওঠে মনে মনে। সে যেন আর রুমী থাকে না, অন্য একজন হয়ে যায়। তার মতো করে কথা বলে, তার মতো করে চিন্তা করে। একদিন কি ভয়ানক ইচ্ছা করছিল একজনকে ধাক্কা মেরে ট্রাকের সামনে ফেলে দিতে। শেষ পর্যন্ত দেয়নি, হয়তো ঠিক সুযোগটা পায়নি বলে। সে নিজে তখন একটা রেস্টুরেন্টে বসে চা খাচ্ছে বন্ধুদের সাথে। হঠাৎ করে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় একটি বৃদ্ধ লোকের মুখ, অনাহারে দুঃখে কষ্টে শীর্ণ হয়ে আছে। দেখে ওর কোনো করুণা হয় না, উল্টে প্রচণ্ড রাগ ফুঁসে উঠতে থাকে, হারামীর বাচ্চা দুনিয়াটা নোংরা করে ফেললি তোরা—দেই শালাকে ধাক্কা মেরে ট্রাকের নিচে ফেলে! রুমী হঠাৎ একটা ট্রাকের শব্দ শুনতে পায়। দেই শালাকে ফেলে, দেই ফেলে....দেই ফেলে...

হঠাৎ করে রুমী সংবিৎ ফিরে পায়। বন্ধুটি তাকে ডাকছে, কি রুমী, কি হলো তোর?

দরদর করে ঘামছে সে, মুখ চোখ কাগজের মতো ফ্যাকাসে। আস্তে আস্তে বললো, না, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠলো কেমন!

ব্লাড প্রেশার। বন্ধুটির অভিমত দিতে একমুহূর্তে দেরি হয় না, কান আর কপালে গরম লাগতে থাকে না?

হুঁ, অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়ে রুমী।

মনে হয় না কেমন চেপে ধরে আছে?

হুঁ।

ব্লাড প্রেশার, পরিষ্কার ব্লাড প্রেশার। লবণ কম করে খাবি। বন্ধুটির বাবা ডাক্তার অথচ তার নিজের ডাক্তারির যন্ত্রণায় কারো দুই দণ্ড সুস্থ হয়ে থাকার উপায় নেই।

রুমী রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়েই বৃদ্ধটিকে দেখতে পায়, ভিক্ষে করছে। শেষ পর্যন্ত ধাক্কা মেরে ফেলেনি তাহলে। রুমী আস্ত এক টাকা লোকটিকে দিয়ে দিল। বৃদ্ধটি হাত তুলে দোয়া করলো রুমীকে। রুমী গলা নামিয়ে বললো, রাস্তার এতো কাছে দাঁড়াও কেন চাচা? গাড়ি একটা ধাক্কা মারে যদি? ঐপাশে সরে দাঁড়াতে পারো না?

বৃদ্ধটি অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে নির্জীব ভাবে বিড় বিড় করে কি যেন বলে একটু সরে দাঁড়ালো। ভাগ্যের কাছে কি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ! হয়তো এর বাবাও ভিক্ষে করেছে, এর ছেলেও তাই করবে।

কথা শোনার সাথে সাথে দেখতে পাওয়াটা আজকাল নতুন শুরু হয়েছে। আগে শুধু আশেপাশের লোকজনের মনের কথা শুনতে পেত, আজকাল অনেক দূরের লোকজনের মনের কথাও শুনতে পায়, কার কথা শুনতে পাচ্ছে জানে না পর্যন্ত। শুধু যে শুনতে পায় তাই নয় সে নিজে কিছুক্ষণের জন্যে ঐ লোকটি হয়ে যায়, তার মতো করে কথা বলে,

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

তার মতো করে ভাবে এমন কি তার মতো করে দেখে। পরিষ্কার দেখতে পায় কখনো কখনো। হয়তো কারো ভয়ার্ত মুখ, কারো যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারা, কিন্তু কি হচ্ছে বলতে পারে না। কখনো কখনো সে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখে যার অর্থ বুঝতে পারে না, মানুষের বা জন্তু জানোয়ারের আশ্চর্য রূপ, অদ্ভুত সব রং, বিচিত্র রকমের গন্ধ, অর্থহীন নানা শব্দ। রুমীর চেহারা খারাপ হয়ে যেতে থাকে ; রাতে ভালো ঘুম হয় না, খেতে পারে না, প্রায়ই হজমের গোলমাল হয়। মেজাজ সবসময়ে খিটখিটে হয়ে থাকে। সবসময়েই ভেতরে অশান্তি, একটা চাপা ভয়, কখন আবার তাকে কি দেখতে হয়, কি শুনতে হয় যা সে দেখতে চায় না, শুনতেও চায় না। রুমী ঠিক করলো, কাউকে এটা বলতে হবে, জিজ্ঞেস করতে হবে কি করা উচিত তার। কে জানে, হয়তো সে পাগলই হয়ে যাচ্ছে।

কিবরিয়া ভাইয়ের বাসায় গিয়ে তাকে পেল না। দরজায় একটা চিঠি লিখে দিয়ে এলো, বিশেষ প্রয়োজনে এসেছিলাম, আপনাকে পেলাম না। কাল আবার আসবো, সম্ভব হলে বাসায় থাকবেন।

সময় কাটানোর জন্যে সে তার ফুপুর বাসায় গেল। রাতে খাবার জন্যে জোরাজুরি করায় সে খেয়েই নিলো। অনেকক্ষণ থেকেই তার ভেতরে কেমন একটা চাপা অশান্তি এসে ভর করেছে। থেকে থেকে সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, চোখের সামনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব চেহারা ভেসে ওঠে, নারী পুরুষ শিশু, সবাই দুঃখে কষ্টে জীর্ণ শীর্ণ। হঠাৎ হঠাৎ কে যেন কুৎসিত গালি দিয়ে ওঠে ওর ভেতরে, শুনে সে নিজেই চমকে ওঠে।

হলে ফিরে দরজা বন্ধ করে ঘরের বাতি নিভিয়ে, বিছানায় বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো রুমী। পুকুরে আলোর প্রতিফলন পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। তির তির করে কাঁপছে নারকেল গাছের পাতা আর কেমন চুপচাপ হয়ে আসছে চারদিক। রুমীর ঘুম ঘুম লাগতে থাকে, কিন্তু ঘুমোতে পারে না। ভেতরে কেমন জানি একটা চাপা উত্তেজনা। জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখার মতো অবস্থা, কিছু একটা হবে এখন, ও বুঝতে পারে ; রুমীর স্নায়ু অপেক্ষা করে আছে।

খুব আস্তে আস্তে হলো পুরো ব্যাপারটা। প্রথমে ছাড়াছাড়া ভাবে স্বপ্ন দেখার মতো তারপর খুব স্পষ্টভাবে, এতো স্পষ্ট যে রুমীর সারা শরীর শিউরে ওঠে।

সে হাঁটছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটছে অন্ধকারে। অদ্ভুতভাবে হাঁটে সে, ডান পা-টা একটু টেনে টেনে, প্রতি পদক্ষেপে কোমরের কাছাকাছি কোথায় যেন ব্যথা করে ওঠে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখে এদিক ওদিক। অন্ধকার বাড়ি, বন্ধ দোকানপাট। রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে থাকা পথের লোকজন দেখে বিতৃষ্ণায় ওর ভিতরটা বিষিয়ে ওঠে। অবাক হয়ে রুমী দেখলো কি সহজে সে কুৎসতি একটা গালি দিল ওদের।

মন ভালো নেই ওর, প্রচণ্ড রাগ যেন কার ওপরে। ইচ্ছে করে কাউকে লাথি মেরে ফেলে দেয় কোথাও, কারো টুটি ছিঁড়ে নিয়ে আসে। তার ওপর কোমরের কাছে সেই ব্যথা, প্রতি পদক্ষেপে ওর সারা শরীর যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে। প্রচণ্ড রাগ হতে থাকে, ভয়াবহ যুক্তিতর্কহীন অন্ধ রাগ। একজন বুড়ো এগিয়ে আসে কোথা থেকে, যেন অন্ধকার ফুঁড়ে বের হয়ে এসেছে। ভয়ানক চমকে ওঠে সে, আর রাগটা বেড়ে যায় হাজার গুণ।

বাবা, একটা টাকা দিবেন বাবা? সারাদিন খাতি পাইনি।

খাওয়াচ্ছি তোকে, দাঁতে দাঁত চিবিয়ে মনে মনে বললো রুমী, খাওয়াচ্ছি, তোকে এমন খাওয়াবো যে আর খেতে চাবি না।

বহুদূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা যায়, একটা গাড়ি আসছে, কিসের গাড়ি? রুমীর হৃৎস্পন্দন হঠাৎ বেড়ে যায় দশগুণ।

বৃদ্ধটি আবার হাত পেতে দাঁড়ালো। দিবেন, বাবা?

দাঁড়াও। গলার স্বর শুনে রুমী অবাক হয়ে ভাবে কি চমৎকার ভরাট গলার স্বর। বৃদ্ধটি দাঁড়িয়ে থাকে আশা নিয়ে। দূর থেকে গাড়িটা এগিয়ে আসছে আরও কাছে, ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন, ওটা একটা ট্রাক।

বাবা···

এক মিনিট, পকেটে হাত ঢোকায় রুমী। রক্তের কল্লোল শুনতে পায় সে, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে।

ট্রাক আরও কাছে এগিয়ে আসে।

আরও কাছে···

আরও কাছে···

এইবার! প্রচণ্ড ধাক্কায় বৃদ্ধটি ছিটকে গিয়ে পড়ে ট্রাকের সামনে। প্রাণপণে ব্রেক কষার চেষ্টা করে ট্রাক ড্রাইভার, কিন্তু বৃদ্ধটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রায় তিরিশ ফুট দূরে গিয়ে থামে অতিকায় ট্রাক।

ছুট, ছুট, ছুট, প্রাণ নিয়ে ছুট, ধরা পড়ার আগে ছুট। ডান পা-টা টেনে টেনে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো রুমী। ঐ তো যাত্রাবাড়ির মোড়, সাঁকোটা পার হলেই মিশে যাবে সে ছোট ছোট ঝোপঝাড় আর বাড়িঘরের মাঝে। ছুট ছুট ছুট প্রাণপণে ছুট। পিছন ফিরে তাকালো একবার, ট্রাকটা ছেড়ে দিয়েছে, পালিয়ে যাচ্ছে ট্রাক ড্রাইভার।

হা হা করে হেসে উঠলো রুমী, পালিয়ে যাচ্ছে সে ভয় পেয়ে। প্রচণ্ড হাসির দমকে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। পা টন্ টন্ করছে ওর, হাঁটু চেপে বসে পড়লো মাটিতে। পেট চেপে হাসতে থাকলো বসে বসে, হাসি আর থামানো যায় না—কিছুতেই থামানো যায় না।

প্রচণ্ড আঘাতে যেন ঘুম ভাঙলো রুমীর, অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে সে পাগলের মতো হাসছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, বুক ধক্ ধক্ করছে, যেন এখনি ফেটে যাবে, উঠে বসতে গিয়ে ওর মনে হলো ওর মাথা ছিঁড়ে যাবে প্রচণ্ড ব্যথায়। আবার শুয়ে পড়লো রুমী। বালিশের তলা থেকে ঘড়ি বের করে দেখলো, রাত দেড়টা বাজে।

কি করবে সে? একটা মানুষকে ও খুন হতে দেখলো, এখন সে কি করবে?

সে কি খুন করেছে? না, না, কিছুতেই না!

তাহলে ওরকম দেখলো কেন? সব নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন, ভোর হলে দেখবে সব স্বপ্ন।

প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় রুমী কাটা মুরগীর মতো ছট্‌ফট্ করতে থাকে তার বিছানায়।

সারারাত ছট্‌ফট্ করে ভোরের আলো ফোটার পর রুমী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা দুপুর হয়ে গেছে। সকালে এর মাঝে দুটি ক্লাস হয়ে গেছে। এমনিতে সে এমন কিছু নিয়মিত ক্লাসে যাওয়া ছাত্র নয় তবু আজ ওর যাবার ইচ্ছা ছিল,

www.MurchOna.com

একটা ভালো বিষয় পড়ানোর কথা। কিন্তু এ নিয়ে তার মাথা ঘামানোর অবসর নেই, প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে, কিন্তু এতক্ষণে কেন্টিনও বন্ধ হয়ে গেছে। রুমী উঠে হাত-মুখ ধুয়ে গত রাতের কথা ভাবলো, রাতের অন্ধকারে যে ঘটনাটা এতো ভয়াবহ মনে হচ্ছিল দিনের আলোতে সেটাকে অনেক অবাস্তব এমন কি খানিকটা ছেলেমানুষী মনে হতে থাকে। নিশ্চয়ই একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছে সে, এ নিয়ে এতো ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। যদিও সে প্রাণপণে ব্যাপারটি উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল, তবু ওর ভেতরে কোথায় জানি খুঁতখুঁত করতে থাকে।

রুমী পাশের একটা রেস্টুরেন্টে চা নাস্তার অর্ডার দিয়ে রেস্টুরেন্টের খবরের কাগজটি নিয়ে এক কোনায় আরাম করে বসে। মধ্যপ্রাচ্যে আবার নতুন ঝামেলা বেধেছে, ব্যাংককে প্লেন হাইজ্যাক, আফ্রিকাতে খাদ্যাভাব এই ধরনের খবরগুলিতে চোখ বোলাতে বোলাতে রুমী নিজের অগোচরে যাত্রাবাড়িতে ট্রাক দুর্ঘটনার খবরটি খুঁজতে থাকে। রুমী আগে কখনো লক্ষ্য করে দেখেনি যে প্রতিদিন অনেকগুলি করে মানুষ দুর্ঘটনায় মারা যায়, বেশির ভাগই ট্রাক দুর্ঘটনা। সারা খবরের কাগজ খুঁজেও যাত্রাবাড়ির ঘটনাটা না পেয়ে রুমী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। রাতের ঘটনা পরদিন ভোরেই কাগজে পাওয়া যায় কিনা এ নিয়ে সন্দেহটুকু সে জোর করে সরিয়ে রাখলো।

নাস্তা শেষ করে সে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা আরামের ভঙ্গি করে চেয়ারে হেলান দিয়ে পকেটে হাত দেয়। সিগারেট খাওয়া আজকাল বেশ রপ্ত হয়ে গেছে, চায়ে চুমুক দিলেই ওর আজকাল সিগারেটের তৃষ্ণা পেয়ে যায়। খবরের কাগজটি ভাঁজ করে সরিয়ে রাখতে গিয়ে ওর চোখে পড়ে খবরের কাগজের নিচে ছোট ছোট করে লেখা, শেষের খবর ঃ গত রাতে যাত্রাবাড়িতে এক ট্রাক দুর্ঘটনায় জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে। শেষ খবর অনুযায়ী ট্রাক ড্রাইভার পলাতক।

রুমী স্তব্ধ হসে বসে রইলো, হাতের সিগারেটের ছাই লম্বা হয়ে জমে এক সময়ে টুক করে ভেঙে ওর কোলের উপর পড়ে, তবু ওর সিগারেট টানার কথা মনে পড়ে না।

প্রচণ্ড রোদ, গরমের হল্কা ছুটছে যেন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে রুমী হেঁটে বেড়ায় রাস্তা ধরে। কেমন একটা চাপা অভিমান ওর বুকের ভিতর গুমরে উঠছে। ইচ্ছে করে কোথাও বসে হু হু করে খানিকক্ষণ কেঁদে নেয়। কেন সে এরকম হয়ে গেল, কি দোষ তার? কি করেছে সে? এতটুকু শান্তি নেই ওর ভিতরে। সেই ভয়াবহ রাতে তার উপর যখন প্রেতের আবির্ভাব হয়েছিল তারপর থেকে সব ওলটপালট হয়ে গেছে। এতদিন সে কিছু বিশ্বাস করেনি, ভেবেছে ডাক্তারের কথাই ঠিক, মারাত্মক যত ওষুধ তাকে ভয়াবহ সব অনুভূতি দিয়েছে। এখন সে আর ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করে না। হয়তো সত্যিই তার উপরে প্রেতের আবির্ভাব হয়েছিল, সে-প্রেত কখনো ফিরে যায়নি, তার ভিতরে রয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সে নিজেও এখন প্রেতের মতো হয়ে যাচ্ছে, সব অশুভ ব্যাপার সে দেখতে পায়, শুনতে পায়, বুঝতে পারে। কোনো ভালো জিনিসের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে শেষ হয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন সে রমনা পার্কের কাছে চলে এসেছে। কিছুক্ষণ গাছের ছায়ায় দেয়ালের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে রইলো। হঠাৎ হঠাৎ একটু বাতাস এসে ওর সারা শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছিল। খানিকক্ষণ একটা সিগারেট খাওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু মুখে কটু স্বাদ,

দুই টান দিয়েই সে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ছোট অর্ধোলঙ্গ একটা বাচ্চাছেলে সেটা তুলে নিয়ে গভীর পরিতৃপ্তির সাথে টানতে টানতে হেঁটে চলে গেল। কতই বা বয়েস বাচ্চাটার অথচ এখনই তার কত দায়িত্ব। মাথায় একটা টুকরি, হয়তো পাতা কুড়ায়, হয়তো কিছু ফেরি করে বেড়ায়। কি একচোখা পৃথিবী, এই বাচ্চাটির এখন মাথায় টুকরি নিয়ে রোদের মাঝে আরেক জনের ফেলে দেয়া সিগারেট খেয়ে আনন্দ পাবার কথা নয়, স্কুলে বসে পড়ার কথা, দুরন্তপনা করার কথা, মায়ের সাথে মান অভিমান করার কথা···

রুমী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তবু তো বাচ্চাটি তার থেকে সুখী। সে তো সিগারেটটা পর্যন্ত খেতে পারলো না।

আপনি কিভাবে জানেন?

আমি দে–দেখেছি।

কিভাবে দেখেছেন?

রুমী একটু ভেবে বললো, আমি ওখানে ছিলাম।

রাত কয়টা তখন?

একটা দেড়টা হবে।

এতো রাতে ওখানে কি করছিলেন?

রুমী কুলকুল করে ঘামতে থাকে। থানার পাশ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ কি ভেবে হুট্ করে থানার ভিতর ঢুকে পড়ে সে শুধু জানতে চেয়েছিল, যাত্রাবাড়ির অ্যাকসিডেণ্টে ড্রাইভার ধরা পড়েছে কিনা। নিরপরাধ ড্রাইভার ধরা পড়লে সে হয়তো নিজে থেকেই বলতো ড্রাইভারের কোনো দোষ নেই। কিন্তু তাকে কিছু না বলে বসিয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ, একটু উত্তেজনা লক্ষ্য করেছে। তারপর মধ্যবয়স্ক একজন তাকে জেরা করতে শুরু করেছেন। রুমী যা জানতো সব বলেছে, শুধু সে যে নিজের ঘরে বসে পুরো ব্যাপারটি ঘটতে দেখেছে সেটা বলেনি, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না তাই। পুলিস অফিসারের ঠিক সেখানেই আপত্তি, এতো রাতে ঐ রাস্তায় কি করতে গিয়েছিল সে, ঘুরেফিরে শুধু ঐ কথাটিই জিজ্ঞেস করছেন। রুমী বলেছে এমনি ওখানে হাঁটছিল, পুলিস অফিসার সেটা বিশ্বাস করতে চান না।

বলুন কেন গিয়েছিলেন ওখানে।

এমনি হাঁটতে।

এতো রাতে?

হ্যাঁ। ঘুম আসছিল না তাই হাঁটতে বের হয়েছিলাম।

হেঁটে যাত্রাবাড়ি গিয়েছেন?

রুমী একটু থতমত খেয়ে বললো, হ্যাঁ।

হেঁটে?

হেঁটে। রুমী বুঝতে পারে আস্তে আস্তে সে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে। একটি মিথ্যা কথা বললে সেটিকে বাঁচানোর জন্যে আরও দশটি মিথ্যা বলতে হয়। সে মিথ্যা ভালো বলতে পারে না, অভিজ্ঞ পুলিস অফিসারের নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে বাকি নেই। রুমী কুলকুল করে ঘামতে থাকে।

www.MurchOna.com

ক'টার সময় হল থেকে বের হয়েছেন?

ঠিক জানি না। ঘড়ি দেখিনি।

তবু, আন্দাজ?

সাড়ে বারোটা হবে।

কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে আপনাকে বের হতে?

জানি না। রুমী শুকনো গলায় বললো, এতো রাতে সবাই শুয়ে পড়ে।

কেউ দেখেনি তাহলে, পুলিস অফিসার হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে এলেন, যে লোকটি বুড়োটিকে ধাক্কা মেরে ট্রাকের নিচে ফেলেছে তার গলার স্বর কি রকম?

ভরাট স্বর, বেশ ভালো।

তার কথা স্পষ্ট শুনেছেন?

হুঁ।

কি বলেছে সে?

বলেছে, একটু দাঁড়াও তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বের করার ভান করেছে।

কতো কাছে থেকে ওর কথা শুনেছেন?

রুমী ঢোক গিলে বললো, এই দশ বারো হাত।

এতোদূর থেকে স্পষ্ট শুনেছেন ওর কথা?

তাহলে হয়তো আরও কাছে ছিলাম।

কতো কাছে? দেখিয়ে বলুন।

রুমী অনিশ্চিতের মতো একটা দূরত্ব দেখালো, যেটুকু দূর থেকে কথা শোনা সম্ভব।

এতো কাছে?

রুমী মাথা নাড়লো।

সে আপনাকে দেখেনি?

না।

পুলিস অফিসার অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে টানতে থাকেন। এক সময় সিগারেট নামিয়ে ঘুরে ওর দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, কেন মিথ্যে কথা বলছেন?

রুমী ভীষণ চমকে ওঠে, কিন্তু কি বলবে বুঝতে পারে না। আমতা আমতা করে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিস অফিসার কঠোর স্বরে ওকে থামিয়ে দেন, ট্রাক ড্রাইভারকে আজ ভোরে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। সে বলেছে, কে একজন ধাক্কা মেরে বুড়োটিকে ট্রাকের নিচে ফেলে দিয়েছে।

রুমী উত্তেজিত হয়ে বললো, বললাম না, আমি বললাম না···

হাত তুলে থামিয়ে দিলেন ওকে পুলিস অফিসার, ট্রাক ড্রাইভার বলেছে সে তার হেডলাইটে স্পষ্ট দেখেছে সেই লোকটিকে। একা ছিল সে, ধারে কাছে কেউ ছিল না।

রুমী ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে হঠাৎ বুঝতে পেরেছে পুলিস অফিসার কি সন্দেহ করছেন। অসহায় ভয়ের একটা শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ড বেয়ে মাথায় উঠে আসতে থাকে। সে শুনতে পায় পুলিস অফিসার আস্তে আস্তে বলছেন বুড়োটিকে কেন খুন করেছেন?

www.MurchOna.com

পুরোপুরি ভেঙে পড়লো রুমী।

পরদিন কিবরিয়া ভাই হাজতে রুমীর সাথে দেখা করতে এলেন। এক রাতে তার বয়েস দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। শক্ত মেঝেতে কুটকুটে কম্বলে গা ঘিন ঘিন করা দুর্গন্ধ, ভ্যাপসা গরম, মশা আর ছারপোকার কামড়। হাজতবাসী অন্যান্যদের হাসি মস্করা সবই সহ্য করা যায়, কিন্তু খুনের অপরাধে তাকে ধরে রাখা হয়েছে এই চিন্তাটি তাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। রুমী কিবরিয়া ভাইকে নিজের অবস্থাটা বোঝানোর চেষ্টা করলো। কিবরিয়া ভাই গুম হয়ে শুনলেন, তবে কোনো কথা বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না। রুমী খুন করেছে সেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু একেবারে বিনা কারণে পুলিস তাকে অ্যারেস্ট করবে কেন? কিবরিয়া ভাই বেশিক্ষণ থাকলেন না, তার খাওয়ার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন, জামিনের বন্দোবস্ত করে আবার ফিরে আসবেন বলে গম্ভীর মুখে বিদায় নিলেন। রুমী আবার দুর্গন্ধময় অন্ধকার হাজতে অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটকা পড়ে গেল।

এক কোনায় বসে কয়জন তাস খেলছে। মনে হয় এরা ঘুরেফিরে প্রায়ই আসে এখানে। দু'একজনের পুলিসের সাথে ভালো খাতিরও আছে, পান সিগারেট কিনিয়ে আনে ওদের দিয়েই। উচ্চৈঃস্বরে হাসে, কুৎসিত গালাগালি দিয়ে ওঠে একটু পর পর। আশ্চর্য এক জগতের লোক ওরা, রুমী ভয় পেয়ে যায় ওদের দেখে। ওর গা ঘেঁষে এসে বসে বারবার, অশ্লীল রসিকতা করে ওকে নিয়ে। এখানে বেশিদিন থাকতে হলে রুমী পাগল হয়ে যাবে। বিভিন্ন ধরনের লোকজন আছে এখানে। কয়জন প্রচণ্ড মার খেয়েছে, রক্তাক্ত শরীর বীভৎসভাবে ফুলে আছে। একজনের মাথায় টুপি, হাজতের ভিতর নির্বিকার ভাবে নামাজ পড়লো একবার। কয়েকজন বেশ অল্পবয়সী, তাদের ভিতর একজন ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। একজন পাঞ্জাবী আর চশমা পরা ছেলে শান্তভাবে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে, রুমী কথা বলার চেষ্টা করে বেশি সুবিধা করতে পারলো না।

রাত গভীর হয়ে এলে একজন দুজন করে এখানে সেখানে শুয়ে পড়ে। গুমোট গরম আর ভ্যাপসা গন্ধে হাজতের ঘিঞ্জি ঘরটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। রুমী দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরের ঐ সাধারণ পথঘাট বাড়িঘর তার কাছে কতো অচেনা বলে মনে হতে থাকে। কে জানে কিবরিয়া ভাই জামিনের ব্যবস্থা করতে পারলেন কিনা। বসে থাকতে থাকতে এক সময়ে তার চোখে ঘুম নেমে আসছিল, হঠাৎ কে জানি তার ভিতরে একটা কুৎসিত গালি দিয়ে ওঠে। রুমী ভয়ানক চমকে লাফিয়ে উঠে বসে। ঐ লোকটা। কিভাবে সে বুঝতে পারে জানে না, কিন্তু তার কোনো সন্দেহ থাকে না।

ধরতে হবে লোকটাকে, যেভাবে হোক ধরতে হবে। কিভাবে ধরতে হবে জানে না সে, এর আগে কখনো চেষ্টা করেনি, কিন্তু আজ তাকে চেষ্টা করতেই হবে। মাথা ঢেকে সে শুয়ে পড়ে তারপর সমস্ত মনপ্রাণ ইন্দ্রিয় একত্র করে লোকটার কথা ভাবতে থাকে, তার মনের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করতে থাকে। হাজত ঘরে চাপা গলার স্বর, অশ্লীল গালির শব্দ—দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজিয়ে একটা দমকল চলে গেল। ছাদে কোথায় কবুতর বাসা করেছে, বাকবাকুম বাকবাকুম শব্দে প্রেয়সীর মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করছে। বাইরে একটা

www.MurchOna.com

সেপাই হাতের রাইফেল মেঝেতে ঠুকে ঠুকে একটানা একটা শব্দ করে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে রুমীর মনে হতে থাকে সে যেন ভেসে চলে যাচ্ছে—সব শব্দ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ওর কাছে। সে দূরে আরও দূরে চলে গেল, সব শব্দ আস্তে আস্তে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে একসময় একেবারে মিলিয়ে গেল।

...হাঁটছে রুমী। ফাঁকা অন্ধকার রাস্তা ধরে লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে সে পা টেনে টেনে হাঁটছে। প্রতি পদক্ষেপে ওর সারা শরীর ব্যথায় শিউরে উঠছে, রাগ ফুঁসে উঠছে ভেতরে। এদিক সেদিক ওর চোখ নড়ছে দ্রুত, মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে, দুর্বল নিরীহ মানুষ। ওর ভেতরকার রাগটা ঝাড়তে হবে কারো ওপর। ইচ্ছে করছে কাউকে ধরে পশুর মতো নির্যাতন করতে। কিন্তু কিভাবে করবে? ওর সে-ক্ষমতা কই? শক্ত লাঠিটার স্পর্শ পেয়ে ওর হাত নিশপিশ করতে থাকে—আহ্। কারো মাথার ওপর যদি বসিয়ে দিতে পারতো সজোরে, খুলিটা ফাটিয়ে দিতে পারতো এক আঘাতে...

মালিবাগ....মালিবাগ....মালিবাগ....একটা রিকশাওয়ালা ডাকছে। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, কাউকে পেয়ে গেলে আর খালি রিকশা নিয়ে যেতে হয় না। রুমী রিকশাওয়ালার দিকে তাকায় না। খুব বেশি জোয়ান এই রিকশাওয়ালাটা। হাতে পায়ে শক্ত পেশী, সাপের মতো কিলবিল করছে শক্তির প্রাচুর্যে। একে দিয়ে হবে না। লাঠিতে ভর দিয়ে রুমী আবার হাঁটতে থাকে।

রাস্তার পাশে গাছের নিচে ছোট একটা খুপরিতে চায়ের দোকান। ইটের উপর বসে এক বুড়ো চা খাচ্ছে সেখানে, পাশে তার খালি রিকশা। দুর্বল বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে ওর ভিতরে লোভ জেগে ওঠে। একে একবার চেষ্টা করে দেখা যায়, পায়ে ওর ব্যথা কিন্তু হাত দুটি তো ঠিক আছে, দুহাত একত্র করে পিছন থেকে মাথায় মারতে পারলে এক ঘায়ে কাজ শেষ হয়ে যাবে। জিভে পানি এসে গেল ওর।

যাবে নাকি রিকশা?

না, স্যার। বুড়ো চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্তির শব্দ করে।

চলো না, এতো রাতে রিকশা কোথায় পাবো?

পাবেন, স্যার, একটু হাঁটেন তাইলেই পাবেন।

হাঁটতে পারছি না বলেই তো বলছি, পায়ে ব্যথা আমার। চলো, তোমাকে দুই টাকা বেশি দেবো।

কই যাবেন?

ইন্দিরা রোড।

লোকটার যাবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু সে জোর করলো। পায়ের ব্যথা এবং টাকার লোভ দেখিয়ে রাজি করালো।

কি উত্তেজনা! রুমীর ভেতরটা আনন্দে নেচে ওঠে, আর খানিকটা গেলেই অন্ধকার নির্জন অংশটুকু, তখন দুহাত শক্ত করে লাঠিটা ধরে মাথার পিছন থেকে দেবে এক ঘা। আনন্দে খিক্ খিক্ করে হেসে ওঠে সে।

www.MurchOna.com

ঠুন ঠুন করে রিকশা চালিয়ে যাচ্ছে রিকশাওয়ালা, ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ করেনি। অন্ধকার রাস্তায় তাড়াতাড়ি চালাচ্ছে সে, মাঝে মাঝে গুণ্ডারা নাকি এখানে হামলা করে। পিছনের সীটে বসে রুমী দুই হাতে ধরে ল্যাঠি উপরে তুললো, তারপর প্রচণ্ড এক ঘা।

ছোট একটা আর্তচিৎকার করে রিকশার হ্যাণ্ডেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রিকশাওয়ালা। রিকশা তাল সামলাতে না পেরে ঘুরে রাস্তার পাশে গড়িয়ে যাচ্ছিল, একটা লাইটপোস্টে ধাক্কা লেগে থেমে গেল। অদ্ভুতভাবে হ্যাণ্ডেলে ঝুলে আছে বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা, মাথা থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে। রুমী লাফিয়ে নামলো রিকশা থেকে, পালিয়ে যেতে হবে এখন, কেউ দেখে ফেলার আগে···

হঠাৎ রুমী সংবিৎ ফিরে পায়। এই লোকটাকে থামাতে হবে, কিছুতেই ওকে পালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না, কিছুতেই না, কিছুতেই না। কিন্তু রুমীর কিছু করার নেই। লোকটা পা টেনে টেনে হেঁটে চলে যাচ্ছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। আর একটু গেলেই ঐ গলির ভিতরে ঢুকে যাবে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে তখন।

রাস্তা ঘুরতেই একটা গাড়ি এসে পড়ে ওর সামনে, হেডলাইটে চোখ ধাঁধিয়ে যায় লোকটার। মুখ ঢেকে ফেলে লোকটা ভয়ে, তারপর উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করে। গাড়িটা থেমে গেছে রিকশাটার কাছে। গাড়ি থেকে দুজন লোক নেমে এলো, বৃদ্ধ রক্তাক্ত রিকশাওয়ালাকে ধরাধরি করে নামালো রিকশা থেকে। বিড়বিড় করে কি যেন বললো রিকশাওয়ালা, সাথে সাথে লোক দুটি চিৎকার করে উঠলো, ধর শালা ল্যাংড়াকে···

ভয়-ভয়-ভয় জান্তব ভয় ওর ভিতরে। ছুটে যেতে চেষ্টা করছে সে, পা টেনে টেনে ছোটা যায় না, ব্যথায় ককিয়ে উঠছে, তবু প্রাণপণে ছুটতে থাকে। কিন্তু পিছন পিছন ছুটে আসছে দুজন, লম্বা লম্বা পা ফেলে ধরে ফেললো প্রায়। প্রচণ্ড ভয় হলো ওর, ঘুরে দাঁড়ালো হঠাৎ, দুই হাতে শক্ত করে ধরলো লাঠি···

কিন্তু তার আগেই মুখে প্রচণ্ড ঘুসি। মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে, মার শালা শূয়োরের বাচ্চাকে—প্রচণ্ড লাথি পড়লো ওর পেটে। ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল লীগে হাফ ব্যাক খেলে নীলু, ওর এক লাথিতে বল মাঠ পার হয়ে যায়। লোকটা জ্ঞান হারালো প্রচণ্ড যন্ত্রণায়।

থর থর করে কাঁপছে রুমী, ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হাজতের সব ক'জন লোক। চশমা পরা ছেলেটা ডাকছে ওকে, কি হয়েছে? এই ছেলে, কি হয়েছে তোমার?

রুমী উঠে বসে। তখনো ওর সারা শরীর কাঁপছে, কোনোমতে বললো, না, কিছু না।

কে একজন বললো, মৃগী ব্যারাম। উঠতে দেবেন না, চেপে ধরে নাকের কাছে জুতাটা ধরেন।

রুমী ওদের কথায় কান দিল না, দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকাডাকি করতে থাকে, এই যে, কে আছেন? শুনে যান···

একজন সেপাই ঘুম ভাঙা গলায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কি হয়েছে?

ও. সি. সাহেবকে ডাকেন একবার, ভয়ানক জরুরী দরকার।

ঘুমা শলা শূয়োরের বাচ্চা। এখন আমি ও. সি. সাহেবকে ডাকি!

কে একজন হো হো করে হেসে ওঠে হাজতের ভেতর। রুমী তবু হাল ছাড়লো না, বললো, গিয়ে বলেন আসাদ গেটের কাছে ধরা পড়েছে ঐ পা খোঁড়া লোকটা।

www.MurchOna.com

সেপাইটি খানিকক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, তারপর খেঁকিয়ে ওঠে বিশ্রীভাবে।

বিশ্বাস করেন। একটা রিকশাওয়ালার মাথায় লাঠি মেরে...

চোপ শালা হারামজাদা, আর একটা কথা বলবি তো দাঁত ভেঙে দেবো।

রুমী চুপ করে গেল। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না। রাত তিনটের সময় সেই পুলিস অফিসার নিজে এসে রুমীকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেন্ট্রি সেপাইটা চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে নিজের কানে শুনেছে রুমী বলেছে আসাদ গেটের কাছে খোঁড়া লোকটা ধরা পড়েছে, রিকশাওয়ালাকে মেরে পালিয়ে যাচ্ছিল। কি করে বললো ও? একটু আগে থানায় দুজন এসে ডায়েরী করিয়ে গেছে। রিকশাওয়ালা আর খোঁড়া লোকটাকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। সেপাইটা একটু এগিয়ে রুমীর কাছে গলা নামিয়ে বললো, আপনি কিভাবে জানলেন? হাজতেই তো ছিলেন সারাক্ষণ!

কিছুক্ষণ আগেই সে তার দাঁত ভেঙে ফেলার ভয় দেখাচ্ছিল, কিন্তু তা আর মনে রাখেনি রুমী। একটু বিব্রত ভাবে বললো, জানি না, কি করে যে জানলাম!

আপনি রাগ করেননি তো, স্যার? মুখটা খারাপ আমার।

না, না।

কিভাবে বুঝবো, স্যার? এতোগুলি চোর ছ্যাঁচোড়ের মাঝে যে আপনিও আছেন আমি কিভাবে জানবো?

হুঁ। মাথা নাড়ে রুমী, তা তো বটেই।

কিছু মনে করবেন না, সার। বাচ্চাকাচ্চার বাপ আমি—সেপাইটা ভয় পেয়ে যায়।

না, না রাগ করবো কেন?

পুলিস অফিসার অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রুমীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন, কোনো শালা বিশ্বাস করবে না!

কিসের কথা বলছে বুঝতে পেরে একটু হাসার ভঙ্গি করলো রুমী।

কোর্টে কেস ওঠার সময় একেবারে চেপে যেতে হবে পুরো ব্যাপারটা। কোনো শালা বিশ্বাস করবে না, আর বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে ল্যাংড়া!

চুপ করে থাকে রুমী।

আপনি কাউকে বলবেন না, খবরের কাগজ যেন খোঁজ না পায়, আপনার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে! আমি এদিকটা সামলাবো।

রুমী ব্যস্ত হয়ে বললো, হ্যাঁ, প্লীজ, আমি চাই না কেউ জানুক।

জানবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। একটু হেসে পুলিস অফিসার আন্তরিক গলায় বললেন, এতো রাতে আর কোথায় যাবেন? আমার বাসায় চলুন, এই কাছেই আমার বাসা।

না, না, থাক। আমি হলে ফিরে যাই বরং, ভালো করে গোসল করে ঘুমাবো।

আমার বাসায় চলুন, গোসলের ব্যবস্থা করে দেব। কিছু খেয়ে ঘুমোবেন, হাজতে থেকে কি চেহারা হয়েছে আপনার!

www.MurchOna.com

কোনো কথা শুনলেন না তিনি, তাকে বাসায় নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক একটু স্ত্রী-পাগল, রুমীর ব্যাপারটা শুধু গল্প করে মন ভরবে না বলে নিজের চোখে দেখাতে চাইছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। তার মতো আর কয়টা কেস আছে এই পৃথিবীতে?

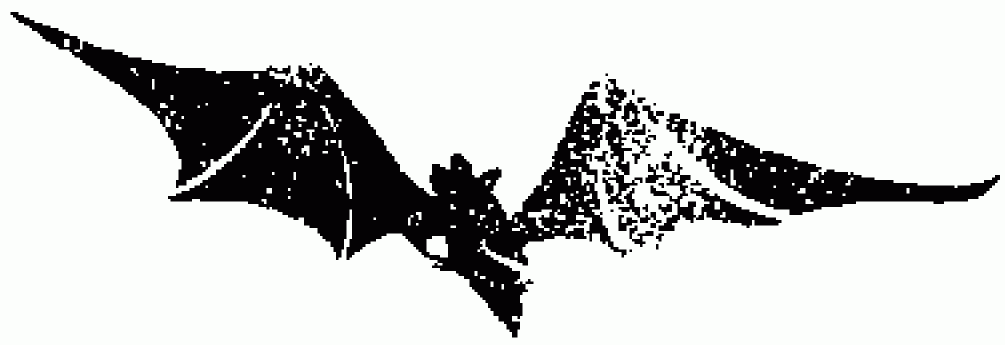

www.MurchOna.com
==

সাত

নৃশংসে ঃ ঢাকা, ২১ জুন ; গতরাত একটার সয় আশফাক হাসান (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে নির্মমভাবে জনৈক রিকশাওয়ালার মাথায় আঘাত করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। উক্ত আশফাক হাসানের স্বীকারোক্তিতে আরও জানা যায়, সে পূর্ব রাত্রিতে যাত্রাবাড়ির নিকটে কদম আলী নামক এক পথচারীকে চলন্ত ট্রাকের সামনে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। পুলিস সূত্রে জানানো হয় যে, এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের এখন পর্যন্ত কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নাই। রিকশা চালক সৈয়দ ইমতিয়াজ আলীকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে, তার অবস্থা সংকটজনক। আশফাক হাসান ঢাকার প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডঃ আবিদ হাসানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বৎসরাধিককালে পূর্বে জার্মানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উক্ত আশফাক হাসান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। শেষ খবর পাওয়া আনুযায়ী জোর পুলিসী তদন্ত চলিতেছে।

শহরে রিকশা ধর্মঘট ঃ ঢাকা, ২২ জুন, রাত এগারোটার সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহত রিকশাচালক সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে (ইন্না লিল্লাহ......রাজেউন)। জনৈক আশফাক হাসান পূর্বরাত্রে রিকশার সীটে বসে লাঠি দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে। সৈয়দ ইমতিয়াজ আলীর মৃত্যুতে ঢাকা নগরী রিকশাচালক ইউনিয়নের আহ্বানে সারা শহরে রিকশা ধর্মঘট পালন করা হয়। জানাজার পর ক্ষুব্ধ রিকশাচালকেরা শোভাযাত্রা সহকারে সৈয়দ ইমতিয়াজ আলীর মৃতদেহ বহন করে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। আজিমপুর গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করে ফিরে আসার পথে ক্ষুব্ধ রিকশাচালক এবং জনতা উক্ত আশফাক হাসানের পিতা ডঃ আবিদ হাসানের বাসা ঘেরাও করে। পুলিস অনেক কষ্টে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয় নাই।

সম্পাদকীয় ঃ আমাদের সমাজে ভায়োলেন্স কম তাহা এখন জোর করিয়া বলা মুশকিল। দশ বৎসর আগের তুলনায় আজকাল সংবাদপত্রে অনেক বেশি হত্যাকাণ্ড বা অন্য ধরনের নৃশংসতার বিবরণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এইসব হত্যাকাণ্ড বা নির্মমতা কখনোই সম্পূর্ণ বিনা কারণে ঘটে নাই। সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ, পারিবারিক কলহ, অর্থলোভ কিংবা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া এই হত্যাকাণ্ডগুলি সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু এই দেশে সম্পূর্ণ বিনা কারণে হত্যাকাণ্ড বোধ করি এই প্রথম ঘটিল। আশফাক হাসান নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত, বিদেশ হইতে তথাকথিত উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র মনের খেয়াল মিটাইবার জন্য দুই-দুইটি নির্মম হত্যাকাণ্ড করিয়াছে বলিয়া পুলিস সূত্রে জানানো হইয়াছে। বিদেশে এই ধরনের নমুনার অভাব নাই। ব্রিটেনের জ্যাক দা রিপার, ইদানীংকার ইয়র্কশায়ার রিপার, আমেরিকার স্যান অফ স্যাম, হিলসাইড স্ট্র্যাংলার, ফ্রী ওয়ে কিলার বা আটলাণ্টার শিশু

হত্যাকারী বিভিন্ন সময়ে সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদেশে শিক্ষা লইতে গিয়া যদি এই দেশের যুবকেরা এই প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতে থাকে...

খুব সাবধানে পরের ক'দিন সবক'টি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লো রুমী। তার সম্পর্কে কোথাও একটি কথাও লেখা হয়নি। তার ব্যাপারটি কোনভাবে প্রকাশ পেয়ে গেলে চমৎকার এটি খবর হতো, প্রথম পৃষ্ঠায় তার ছবি এবং নিচে 'তরুণের অলৌকিক রহস্যভেদ' বা এই ধরনের একটা কিছু লিখে একটি ছোটখাট আলোড়নের সৃষ্টি করা যেতো। কিন্তু পুলিস অফিসার তাঁর কথা রেখেছেন, তাই রুমীকে একটি আলোড়নের কেন্দ্রস্থল হওয়ার বিড়ম্বনা সহ্য করতে হলো না। এমনিতেই তার সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর আবার নতুন বিড়ম্বনার জায়গা কই?

প্রাথমিক উত্তেজনাটুকু কেটে যাবার পর কিবরিয়া ভাই রুমীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বড় বড় ডাক্তার এবং নিউরোলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করে রুমীকে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে পরীক্ষা করলেন। রক্ত, কফ মলমূত্র কিছুই বাকি থাকলো না। তার ই.ই.জি.-ই.সি.জি. করানো হলো, কিবরিয়া ভাই বিভিন্ন জায়গায় কথাবার্তা বলে প্রায় বিনা খরচে করিয়ে দিলেন সব। ডাক্তারেরা অনেক কঠিন কঠিন অসুখের নাম বলে নিজেরা আলোচনা করলেন, তার বেশির ভাগই বুঝতে পারলো না রুমী। তার মস্তিষ্কের ছোট্ট একটা অংশ পাকাপাকি ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যার জন্যে কোনো কোনো ব্যাপার সে কিছুতেই মনে করতে পারে না। আবার তার মস্তিষ্কের সামনের অংশে কিছু একটা হয়েছে যা স্বাভাবিক নয়, সেখানকার বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ অন্য কারো সাথে মেলে না। এর পরেই ডাক্তারেরা নিজেদের সাথে আর একমত হতে পারলেন না। কয়েকজন বললেন রুমীর দৈনন্দিন জীবনে এর জন্যে কোনো ধরনের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, অন্যেরা বললেন যে তার চিন্তা করার ক্ষমতা অনেক পরিবর্তিত হয়ে যাবার কথা। অবশ্যি সবাই এক বিষয়ে একমত হলেন যে মস্তিষ্ক সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এতো কম যে তাঁরা কোনো কিছুই জোর দিয়ে বলতে পারেন না। ডাক্তারেরা রুমীকে মনোবিজ্ঞানীর সাথে কথা বলার উপদেশ দিলেন।

কিবরিয়া ভাই খুঁজে খুঁজে তাকে এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক। অবসর সময়ে মানসিক রোগীদের দেখেন। রুমীর নিজেকে মানসিক রোগী হিসেবে কল্পনা করতেও প্রচণ্ড আপত্তি, কিন্তু কিছু করার নেই। মনোবিজ্ঞানী ভদ্রলোক তাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করলন। কিছু কিছু এতো অবান্তর নির্লজ্জ প্রশ্ন যে শুনে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে রুমী। পাকা দুই ঘন্টা তাকে নানাভাবে জেরা করে ভদ্রলোক বললেন, তার সুপ্ত অপরাধ-বোধ নাকি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তার ভেতরে দ্বিতীয় আরেকটা ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব নিজেকে প্রেত হিসেবে কল্পনা করে। কাজেই তাকে সম্মোহিত করে প্রেত-ব্যক্তিত্বকে বের করে এনে সেটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে। সব শুনে সেখানে দ্বিতীয়বার যাওয়ার সাহস হলো না রুমীর। কে জানে, হয়তো ভুল করে তার নিজের ব্যক্তিত্বকেই টেনে বের করে ছিন্নভিন্ন করে দেবে, তারপর আজীবন তাকে প্রেতের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তাছাড়া

www.MurchOna.com

অনেকগুলি করে টাকা নেয়, শুধু গালগল্প শোনার জন্যে এতো টাকা দেয়ার কোনো মানে হয় না।

কিবরিয়া ভাই কিন্তু রুমীকে নানাভাবে জোর করে মনোবিজ্ঞানীর কাছে পাঠানোর চেষ্টা করতে থাকলেন। রুমীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন মানুষের মন কি বিচিত্র, সাধারণ মানুষ যা ধরতে পারে না মনোবিজ্ঞানীরা তা ধরে ঠিক সমস্যাটা খুঁজে বের করতে পারেন। টাকার কথা বলে লাভ নেই, কিবরিয়া ভাই তাহলে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে দেবেন। শেষ পর্যন্ত আর একবার চেষ্টা করতে রাজি হলো রুমী। কিন্তু এই শেষ, যদি তার কোনো উপকার না হয় সে সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেবে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর কাছে আর যেতে হলো না তাকে, তার আগেই একটা ছোট ঘটনা অনেককিছু পাল্টে দিল।

বাসে করে আসছিল ও, প্রচণ্ড ভিড় কিন্তু বসার জায়গা পেয়েছে সে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলো, আবছা আবছা ভাবে সে বুঝতে পারে আবার একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে তার ভেতরে। প্রচণ্ড ভয় আর অস্বস্তিতে ছটফট করতে থাকে রুমী। তাড়াতাড়ি হলে পৌঁছে চারটে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়বে। আগে দুটো খেলেই ঘুমোতে পারতো, আজকাল চারটের কমে হয় না। যখনই তার মনে হয় কোন ধরনের ভয়ানক অভিজ্ঞতা হতে পারে, তখনিই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, পরের দুদিন গা ম্যাজম্যাজ করে, মাথা ভার হয়ে থাকে তবুও সে বেশ কিছুদিন থেকে তাই করে আসছে।

ওর কাঁধে হাত দিল কে যেন। ঘুরে তাকিয়ে দেখে একজন বুড়োমতো লোক। মাথায় সাদা কিস্তী টুপি, পরনে আধময়লা শার্ট, ওর পাশে বসে আছে। গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে ওকে, বাবা, তোমার কি হয়েছে?

অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকায় রুমী, চোখ দুটি কি আশ্চর্য স্বচ্ছ! হঠাৎ করে মনে হয় খুব আপনজন। মাথা নেড়ে বললো রুমী, কিছু হয়নি তো।

লোকটা গলা আরও নামিয়ে বলে, বলো আমাকে, কি হয়েছে?

রুমী আবার বলতে যাচ্ছিল কিছু হয়নি কিন্তু লোকটা বাধা দেয়, আমাকে বলো, আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।

অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রুমী, আপনি কি করে বুঝলেন আমার কিছু হয়েছে?

বোঝা যায় বাবা, মানুষের মুখ দেখলে সব বোঝা যায়। বলো বাবা আমাকে, তোমার কিসের ভয় এতো?

কি বলবে বুঝতে পারছিল না রুমী। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার কিছু একটা হয়েছে তাই এতো অশান্তিতে আছি, কাউকে বললে বিশ্বাস করবে না।

আমি বিশ্বাস করবো, বাবা।

রুমী লোকটার চোখের দিকে তাকায়, এতো আশ্চর্য স্বচ্ছ কোমল চোখ সে জীবনে কখনো দেখেনি। লোকটা দেখতে এতো সাধারণ, আধময়লা কাপড়, মাথায় একটা টুপি,

কিন্তু চোখ দুটির দিকে তাকালে সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। এ সাধারণ মানুষ নয়, রুমীর হঠাৎ তাকে বিশ্বাস হয়, একে সব খুলে বলা যায়। সে গলা নামিয়ে তার কথা বলতে শুরু করে। লোকটা গম্ভীর হয়ে শোনে, একটি দুটি প্রশ্ন করে, তারপর চুপ হয়ে যায় অনেকক্ষণের জন্যে।

বাস ততক্ষণে কার্জন হলের কাছে চলে এসেছে, ওরা দুজনে নেমে পড়ে সেখানে, হেঁটে হেঁটে পুরোনো হাইকোর্টের সামনে একটা গাছের নিচে বসে।

রুমী তার সব কথা শেষ করে বললো, বিশ্বাস হয় আপনার?

লোকটা একটু হেসে আস্তে আস্তে বললো, আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় কত কি আছে, বিশ্বাস না করলে চলে না, বাবা। আমি নিজে কত কি দেখেছি, বললে লোকে পাগল ভাববে। তোমার কোনো ভয় নেই বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিভাবে?

এমনি ঠিক হয়ে যাবে, বাবা। তোমার ভেতরে একটা ক্ষমতা হয়েছে যেটা অন্য লোকের নাই। কেন হলো অমি জানি না। আশ্চর্য মানুষের মন, কিভাবে কাজ করে কেউ জানে না। হয়তো ঐসব লোক তোমার মাথায় কিছু করেছে, হয়তো তোমার মাথায় অপারেশান করার সময় কিছু হয়েছে, কে জানে এমনিতেই হয়তো হয়েছে। তোমার এটা ভালো লাগে না, তুমি ভয় পাও সেটাই হয়েছে তোমার জন্যে মুশকিল। তুমি ভয় পেয়ো না, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মন তোমার কথায় ওঠে বসে, যা তোমার ভালো লাগে না তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

কিন্তু...

হ্যাঁ, বাবা। তুমি অশিক্ষিত লোক হলে তোমাকে একটা তাবিজ দিয়ে বলতাম, এটা গলায় ঝুলিয়ে রাখো তোমার আর অসুবিধা হবে না। তুমি সেটা বিশ্বাস করে ভাবতে তোমার আর কিছু হবে না, তখন সত্যিই তোমার কিছু হতো না। কিন্তু তুমি যে মূর্খ লোক নও, তোমাকে ঠকাই কেমন করে বলো?

একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো রুমী, এতো সহজ ব্যাপারটা?

হ্যাঁ, বাবা। এতো সহজ। যদি তুমি চাও। আর যদি না চাও অনেক কঠিন। তুমি যদি মনে করো, বিশ্বাস করো তোমার আর কোনদিন এরকম হবে না তাহলে সত্যিই কোনদিন হবে না। তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। তোমার মন তোমার কথায় ওঠে বসে, সেটা তোমার বিশ্বাস করতে হবে। নিজের উপরে বিশ্বাস। পারবে?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে রুমী। লোকটা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, এর মানে পারবে না! বিশ্বাস নেই নিজের ওপর।

না, বিশ্বাস থাকবে না কেন। কিন্তু...

ঐ কিন্তুটাই হচ্ছে বিশ্বাসের অভাব। তুমি জানো না, বাবা, মানুষের ভেতরে কি শক্তি আছে। পৃথিবীতে কিছু নেই যা মানুষের সাথে পারে, মানুষ জানে না বলে ভয় পায়। যখন ভয় পায় তখন সেই শক্তি চলে যায়। তুমি তোমার ক্ষমতাটা পছন্দ করো না, যদি করতে তাহলে কি বলতাম জানো?

কি?

www.MurchOna.com

বলতাম ঐসব লোকগুলোর ওপর তুমি জোর খাটাও, ওদের সব শক্তি কেড়ে নাও, ওদের জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি তোমার ক্ষমতাটা পছন্দ করো না, তোমার কাছে খারাপ মনে হয়। তাই তোমাকে আমি কখনো বলবো না সেটা করত। কিন্তু তুমি নিজেকে কষ্ট দিও না। যেটা পছন্দ করো না সেটা কেন ঘটতে দাও? এটা তো অসুখের বীজাণু নয় যে রক্তের মাঝে আছে। এটা তোমার নিজের মন, ধমক দিয়ে থামিয়ে দাও। যদি না পারো নিজেকে ব্যস্ত রাখো, বন্ধুর সাথে গল্প করো, কিছু তৈরি করো, কিছু ভেঙে ফেলো, রাজনীতি করো, তর্ক করো, ঝগড়া করো, মারামারি করো, কিছু একটা করো। বসে থেকে তোমার মাঝে ওটা ঘটতে দিও না।

লোকটা একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বলে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। গলা নামিয়ে বললো, বাবা, কিছু মনে করোনি তো?

না, না, মনে করবো কি? আপনি তো ঠিকই বলেছেন, আমি আসলেই কিছু করি না। একা একা থাকি, আমার ভালো কোনো বন্ধু নেই। সবসময়ই ভয় ভয় করে, মনে হয় এই বুঝি আবার কিছু হলো।

হ্যাঁ, বাবা। নিজের কাছে নিজে হেরে যেও না। এখন নিজের উপর বিশ্বাস নেই তাতে ক্ষতি কি? আস্তে আস্তে হবে। যখন নিজেকে বুঝতে পারবে তখন খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস ফিরে আসবে। আজ রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোবে বলছিলে না?

হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিল রুমী। আবার সব একসাথে মনে পড়ে যায়। সাথে সাথে চাপা অস্বস্তি, ভয় সব একসাথে ফিরে আসে। রুমীর মুখে তার স্পষ্ট ছাপ পড়ে।

এই যে, এই যে, বাবা, তুমি আবার ভয় পাচ্ছো। লোকটা হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আজ রাতে যদি তোমার কিছু না হয় তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

আপনার কথা আমি কখনো অবিশ্বাস করিনি।

আমি বলছিলাম তোমার কথা, নিজের ওপর বিশ্বাসের কথা। করবে?

করবো।

তার জন্যে তুমি কতোটুকু কষ্ট করতে পারবে, বাবা?

যতোটুকু দরকার।

পুরো রাত?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। লোকটা শার্টের পকেট থেকে একটা ওষুধের শিশি বের করে বলে, এটা খুব একটা দরকারী ওষুধ, বাজারে পাওয়া যায় না। টাঙ্গাইলে একজনের এটা খুব দরকার। আজ রাতের মধ্যে এটা যদি তাকে খাওয়ানো যায় তাহলে সে বেঁচে যেতে পারে। আমি এটা নিয়ে টাঙ্গাইল যাচ্ছিলাম। এখন আমি আর যাবো না। তুমি এটা পৌঁছে দিয়ে এসো, বাবা।

শুনে একটু হকচকিয়ে যায় রুমী, সে এ ধরনের কিছু আশা করেনি। লোকটার সদিচ্ছায় ওর কোনো সন্দেহ নেই, যদি সত্যি ওষুধটা টাঙ্গাইলে পৌঁছে দিয়ে এলে সে ভালো হয়ে যায়, তাহলে কেন যাবে না? কিন্তু ওর ভয় ভয় করতে থাকে, এখন ওর ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে থাকার কথা।

www.MurchOna.com

লোকটা পকেট থেকে ক'টা দুমড়ানো মোচড়ানো নোট বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ভাড়াটা···

সে কি, আপনি ভাড়া দেবেন কেন, আমি দিয়ে দেব।

না, বাবা, কাজটা আমার। তাছাড়া আমি চাই তুমি এখান থেকে সোজা রওনা দিয়ে দাও।

কেন? হল থেকে কয়টা দরকারী জিনিস একটা ব্যাগে···

না, বাবা, তুমি সোজা এখান থেকে যাবে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওষুধটা পৌঁছানো দরকার; কিন্তু আমি সেজন্যে বলছি না, আমি তোমার নিজের জন্যেই বলছি। নাও, বা, টাকাগুলি ধরো।

রুমী একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আমার পকেটে কিছু টাকা আছে, টিউশানি বাবদ গত মাসের টাকাটা সে আজকেই পেয়েছে। যাওয়া আসার ভাড়া উঠে যাবে।

তবু এটা রাখো, বাবা। ভাড়া যদি নিজে দিতে চাও, দিও। এই টাকাটা তাহলে ঐ লোকটাকে দিয়ে দিও। লোকটা পকেট হাতড়ে একটা চিরকুটের মতো কাগজ বের করে ওর হাতে দেয়, উপরে লেখা কোথায় যেতে হবে।

ঠিক আছে, বাবা, তুমি তাহলে যাও। মনে রেখো, আজ রাতে এই ওষুধটা খেলে লোকটা হয়তো বেঁচে যাবে। আল্লাহ্‌ যদি চান তাহলে তার জীবনটা এখন তোমার হাতে। লোকটা তার শক্ত হাতে রুমীর হাত স্পর্শ করে বিদায় নেয়, আল্লাহ্‌ তোমার ভালো করবেন, তুমি এখন যাও, বাবা। রুমীর উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে অনুনয়ের স্বরে বলে, বাবা তুমি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না, মিথ্যে বলতে আমার কুব কষ্ট হয়···

রুমী আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। কি আশ্চর্য লোক! ও তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটাকে চলে যেতে দেখে। দ্রুত হেঁটে রাস্তার লোকজনের মাঝে মিশে গেল লোকটা, কে জানে আর কখনো দেখা হবে কিনা।

সে-রাতের অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা নেই। রুমী রাতের অন্ধকারে বাসের পিছনে বসে আছে। প্রচণ্ড ঝড় বাইরে, আকাশ চিরে বিজলী নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। বাস যাচ্ছে আহত জন্তুর মতো শব্দ করতে করতে। মাঝে মাঝে চাপা দুঃস্বপ্নের মতো কি একটা ওর ওপর ভর করতে চায়, কিন্তু সে প্রাণপণে তার সাথে যুদ্ধ করে, ওর ওপর এখন একজন অসুস্থ মানুষের জীবন মরণ নির্ভর করছে, এখন সে অন্য কিছুকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে ও, মন থেকে সব চিন্তা দূরে সরিয়ে দেয়, তারপর বাইরে ঝড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রথম একবার দুবার ওর মনে হতে থাকে সে বুঝি পারবে না, প্রায় হাল ছেড়ে দিতে গিয়ে অনুভব করে, ভেতরে কে যেন ক্রমাগত বলতে থাকে—না, না, না কিছুতেই না, কি-ছু-তে-ই-না! আর সত্যি সত্যি কিছুক্ষণ পর ও বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আবার বের হয়ে আসে। আস্তে আস্তে ও সাহস ফিরে পায়। বুঝতে পারে সত্যি সত্যি সে যদি চায়, তাহলে আর চেতনা হারিয়ে অন্ধকার জগতের দাসত্ব করতে হবে না। ঐ অনুভূতিটা কি আনন্দের, কি পরিতৃপ্তির, ওর বহুকাল এরকম অনুভূতি হয়নি।

www.MurchOna.com

মাঝ রাতে বাস যখন টাঙ্গাইল পৌঁছেছে তখন বাসের সবাই আধো ঘুমে, সে নিজেও খুব ক্লান্ত, কিন্তু ওর চোখে ঘুমের রেশ নেই, মনে ফুরফুরে একটা আনন্দ। বাস স্টেশনের কাছে একটা রেস্টুরেন্টে গরম এক কাপ চা খেয়ে সে চাঙ্গা হয়ে নিল। রেস্টুরেন্টের লোকজনকে ঠিকানাটা দেখিয়ে সে-জায়গাটা কোথায় সে-সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেয়। ভাগ্য ভালো থাকলে এতো রাতে রিকশা পেতেও পারে, কিন্তু পুরো রাস্তা রিকশা করে যাওয়া সম্ভব না, অন্তত মাইলখানেক ওকে হাঁটতে হবে। সে-নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই রুমীর, হালকা মনে শিস দিতে দিতে বের হয়ে পড়ে।

বাসাটা সে বেশ তাড়াতাড়িই খুঁজে বের করে ফেলে। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, বাঁশের ঘরের উপর নড়বড়ে টিনের ছাদ। ভেতরে কোথায় জানি একটা মিটমিটে বাতি জ্বলছে। রুমী দরজার কড়া নাড়ে, বেশ অনেকক্ষণ পর জানালা খুলে একজন মেয়ে ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করে, কে?

আমি, ঢাকা থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছি।

ওষুধ! মেয়েটা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, ওষুধ এনেছে মা, ওষুধ!

দরজা খুলে হারিকেন হাতে একজন মহিলা পাগলের মতো বের হয়ে এলেন। রুমীর হাত জড়িয়ে ধরে সাগ্রহে ওষুধটা হাতে নিলেন। উদভ্রান্তের মতো চেহারা, ঝড়ে দিকভ্রষ্ট নাবিকের চেহারাও বুঝি এতো ব্যাকুল নয়। রুমীকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে তারা ভিতরে চলে গেল। ভিতর থেকে অস্ফুট কথাবার্তা শোনা যেতে থাকে, চামচের টুংটাং শব্দ, একটু চাপা কান্না, দীর্ঘশ্বাস। রুমী চুপচাপ বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভেতরে একজন মানুষ মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছে, ও কখনো দেখেনি মানুষটাকে, কিছু জানে না তার সম্পর্কে, কিন্তু তবু কি আশ্চর্য, বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছে সে, মনপ্রাণে কামনা করছে লোকটা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসুক!

দুদিন পর ফিরে এলো রুমী। অসুস্থ লোকটা উঠে পথ্য করার পর। দুদিনের পরিশ্রমেই সে বেশ শুকিয়ে গেছে, পরিবর্তনটা সবাই লক্ষ্য করে। ও এখন অনেক হাসিখুশি, অনেক চঞ্চল। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে সে। ও জানে, ও ভালো হয়ে গেছে।

সাদাসিধে সেই লোকটাকে রুমী অনেক খুঁজেছে, আর পায়নি। নিজের অজান্তে লোকজনের ভিড়ে সেই মুখটা খুঁজতে থাকে, বড় ইচ্ছা করে আরেকবার কথা বলতে, অন্তত কৃতজ্ঞতাটুকু জানাতে। কিন্তু তাকে আর কখনো দেখেনি সে।

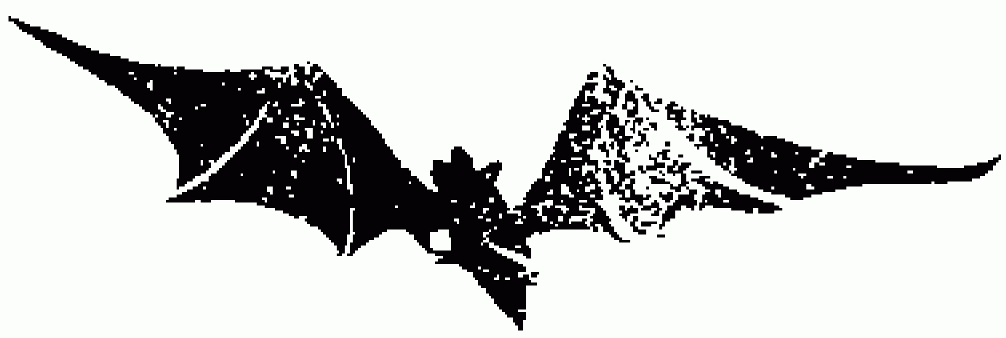

www.MurchOna.com

তৃতীয় অংশ
আরেক বিধাতা

আট

তিন বছর পর।
তিন বছর অনেক সময়, অনেক কিছু ঘটতে পারে এর মধ্যে, কিন্তু রুমীর খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে কিছুটা, তার উপর গোঁফ রেখেছে, তাই দেখতে একটু ভারিক্কি লাগে আজকাল। চিন্তা ভাবনা অনেক স্পষ্ট হয়েছে, দেশ বিদেশের সত্যি খবর রাখে তাই আপাতদৃষ্টিতে তাকে উচ্চাশাহীন সাদামাঠা ছেলে বলে ভুল হতে পারে। বই পড়ার অভ্যাস দিনে দিনে আরও বেড়েছে। চোখ খারাপ হয়ে থাকতে পারে, ক্লাসে পিছনে বসলে সে বোর্ডের লেখা ভালো দেখতে পায় না, তবুও কখনো চোখের ডাক্তারের কাছে যায়নি। ওর ভয় হয় ডাক্তার জোর করে ওকে চশমা দিয়ে দেবেন। চোখে চশমা ও দুচোখে দেখতে পারে না, আলগা বুদ্ধিজীবীর একটা ভাব ফুটে ওঠে যেটা ওর ভারি অপছন্দ।

তিন বছরে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ঘটেছে রুমীর জীবনে। সে প্রেমে পড়েছিল আবার আঘাত পেয়ে ফিরেও এসেছে, এখনো সে ভুলতে পারে না, প্রায় প্রতিদিনই তার বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যায়। চমৎকার মেয়েটি ছিল, ওদের ক্লাসের অনেকেই ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়েছিল মেয়েটির জন্যে। সুন্দরী হিসেবে মেয়েটিকে ওরও ভালো লাগতো, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করতো গল্প করতে কিন্তু কখনো সে-চেষ্টা করেনি। ওর ধারণা ছিল যেচে কোনো মেয়ের সাথে গল্প করা হ্যাংলামোর পর্যায়ে পড়ে। ওদের একজন শিক্ষক তখন নতুন পি. এইচ. ডি. করে এদেশে ফিরে এসেছেন। সুদর্শন অল্পবয়সী ভদ্রলোক, করিডোরে দাঁড়িয়ে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাথে গল্প করতে ভালোবাসেন। ফাজিল ছেলেরা বলে, বিয়ে করেননি তাই মেয়ে পছন্দ করার চেষ্টা করছেন। রুমীও দু'একদিন তার গল্প শুনেছে, এমনিতে মানুষটা খারাপ নন, নিজের বিষয়ে জানেন খুব ভালো, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে সাধারণ। রুমী বাজি রেখে বলতে পারে ভদ্রলোক রিডার্স ডাইজেস্ট পড়েন এবং বিশ্বাসও করেন। রুমীর এমনিতে কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোক যখন রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন সে চুপ থাকতে পারলো না। তাঁর প্রথম কথাটি শুনেই সে বলে উঠলো, না, স্যার, আপনি ভুল বলছেন।

ভুল? ভদ্রলোকের ফর্সা চেহারা একটু লাল হয়ে ওঠে। এ সপ্তাহের নিউজ উইকে···

না, স্যার, ওটা ভুল। নিউজ উইকের খবরটা পড়তে পারেন কিন্তু তার অ্যানালিসিস পড়বেন না। ওটা ওয়েস্টার্ন দৃষ্টিভঙ্গি। আমি আপনাকে চারটি ভিন্ন ভিন্ন কাগজের নাম বলতে পারি যারা ওরকম করে দেখবে না। রুমী কাগজগুলির নাম বললো, কে কি লিখেছে তাও বললো। কিবরিয়া ভাইয়ের কাছে সে তর্ক করা শিখেছে, উদাহরণ না দিয়ে সে কখনো কথা বলে না।

তাই বলে তুমি নিউজ উইককে অবিশ্বাস করবে? জানো ওদের সার্কুলেশন কতো?

www.MurchOna.com

রুমী সঠিক সংখ্যাটি বলতেই ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গেলেন। রুমী ঠাণ্ডা গলায় ভদ্রলোককে বোঝাতে শুরু করে, নিউজ উইক টাইম ওরা তো কাগজের ব্যবসা করে। ওরা খবরগুলি এমনভাবে ছাপায় যেন মানুষের পড়তে ভালো লাগে, না হলে লোকে ওদের কাগজ কিনবে কেন। থার্ড ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে ওরা কি ভাবে আপনি কখনো খেয়াল করে দেখেছেন?

ভদ্রলোককে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে উদাহরণ দিতে শুরু করে কবে বাংলাদেশকে নিয়ে কি লিখেছে যা লেখার কোনো মানে হয় না, কবে কোন্ সত্যকে বিকৃত করেছে, কবে কোন্ সত্যকে গোপন করেছে, কবে কোন্ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে অবহেলা করেছে। এটা রুমীর প্রিয় বিষয়, সে এতো জানে এ সম্পর্কে যে আজকাল কিবরিয়া ভাইও তার সাথে সাবধানে কথা বলেন। ভদ্রলোক একেবারে চুপসে গেলেন। এরপর আর কোনো গল্পই জমলো না, ভদ্রলোক একটা ক্লাসের অজুহাত দিয়ে চলে গেলেণ। তিনি চোখের আড়াল হতেই সেই মেয়েটি খুব অবাক হয়ে বললো, তুমি তো খুব জোর দিয়ে কথা বলো, আমি সবসময়ে ভাবতাম তুমি বুঝি খুব চুপচাপ।

রুমী মেয়েটার চোখের দিকে তাকায়, সুন্দর বিস্ময়াভিভূত চোখ দুটি দেখে ওর ভিতরে কি যেন নড়েচড়ে যায়। একটু হাসার ভঙ্গি করে বলে, আমি এমনিতে চুপচাপই। কেউ বিদেশীদের মতো কথা বললে কেন জানি চুপ করে থাকতে পারি না। মাথা চুলকে বলে, বেশি বলে ফেললাম কিনা কে জানে, স্যারের পরীক্ষা সামনে।

মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে খুব মিষ্টি স্বরে। বলে, না–না খুব ভালো করেছো! এখন যদি স্যারের গল্প করা কিছুটা কমে।

ক্লাসের ফাজিল মেয়েটা বললো, কবে যে স্যারের বিয়ে হবে আর আমরা রেহাই পাবো।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। এ নিয়ে খানিকক্ষণ হাসাহাসি চলে, মেয়েটি একটু পরে আবার আগের ব্যাপার টেনে আনে, তুমি বুঝি এসব নিয়ে খুব ভাবো?

রুমীর বুকের ভেতর কি যেন ঘটে যায়, কথা বলতে কষ্ট হয় ওর। কোনমতে বলে, বেশি আর কোথায়!

কিন্তু তুমি তো স্যারকে বলেছো খুব ভালো, এতোগুলো রেফারেন্স দিয়েছো যে বেচারা স্যার কিছুই বলতে পারলেন না। আমেরিকা থেকে এসেছেন মোটে তিন মাস।

মেয়েটিকে রুমীর এত ভালো লেগে যায় যে বলার নয়। ইচ্ছে করে কাছে টেনে এনে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। নিজেকে ওর অনেক বড় মনে হয়, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস অনুভব করে নিজের ভেতর। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে, কি হলো মেয়েটির কে জানে, হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

ফাজিল মেয়েটি বললো, ঐ যা!

এরপর রুমীকে প্রায়ই ঐ মেয়েটির সাথে দেখা যেতে লাগলো—করিডোরে কথা বলছে, কেন্টিনে চা খাচ্ছে, লনে বসে চিনাবাদাম চিবুচ্ছে। এক ছুটির দিনে দুজন লুকিয়ে সিনেমাও দেখতে গেল।

রুমীর জীবনে সবচেয়ে আনন্দের সময় ছিল সেই ক'টা মাস। মেয়েটির জন্যে কি করবে সে ভেবে পেত না। ইচ্ছে করতো মেয়েটিকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে,

www.MurchOna.com

সমুদ্রের ধারে নারকেল গাছের ছায়ায়, নীল আকাশের নিচে নীল সমুদ্রের তীরে যেখানে তরঙ্গ পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে। রাতে পড়তে বসে আনমনা হয়ে যেতো সে।

ঠিক বুঝতে পারেনি রুমী মেয়েটি আস্তে আস্তে কেমন জানি চুপচাপ হয়ে গুটিয়ে যেতে থাকে নিজের ভেতর। প্রায়ই মনে হতো মেয়েটি ওকে কি যেন বলতে চায় কিন্তু পারে না। কি বলতে চায় ও যখন বুঝলো তখন মেয়েটির বিয়ের কার্ড ছাপা হয়ে গেছে। প্রচণ্ড একটা আঘাত পেল রুমী, কেউ যেন ধারালো একটা ছুরি দিয়ে নিপুণ ভাবে ওর ভেতরটা চিরে দিয়ে গেছে। জীবন অর্থহীন হয়ে ওঠে ওর কাছে, প্রচণ্ড শূন্যতা নিয়ে দিনের পর দিন কাটে, কি করবে সে বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে সামলে নিয়েছে নিজেকে, শুধু বুকের ভেতর কোথায় জানি খানিকটা শূন্যতা রয়ে গেছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালে এখনো মেয়েটির কথা মনে হয় ওর। কোথায় আছে সে?

বিয়ের পর পরই মেয়েটি তার স্বামীর সাথে আমেরিকা চলে গিয়েছিল। অনেক চিন্তা করে সে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে যদি না চাইতো ওখানে বিয়ে হতো না। ইচ্ছে করলে সে রুমীকেই বিয়ে করতে পারতো। কিন্তু সে অনেক ভেবে দেখেছে রুমীর সাথে তার খাপ খাবে না। খুব ভালো লাগতো ওর রুমীকে, ইচ্ছে করতো রুমীর মাথা নিজের বুকে চেপে ধরে রাখে, কিন্তু ও জানে বিয়ে হলে সব অন্যরকম হয়ে যাবে। ওর নিজের বোনকে দেখে শিখেছে, কত ভালবাসা ছিল ওর বোনের। বিয়ের একবছরের ভেতর দুজন দুরকম হয়ে গেল, ছোটখাট জিনিস নিয়ে কি ভয়ানক ঝগড়া করে দুজন। ওর নিজের অনেক শখ, বিদেশে যাবে, চমৎকার একটা বাসা হবে দেশে ফিরে এলে, ওর ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা বাসার লনে গুটি গুটি হেঁটে বেড়াবে। লাল একটা গাড়ি হবে ওদের, ছুটিতে ওরা ব্যাংকক বেড়াতে যাবে। কিন্তু রুমী অন্যরকম। ভবিষ্যতের কথা বললেই ওর চোখ স্বপ্নালু হয়ে যায়, টিনের ছাদে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, পাল তোলা নৌকায় বসে হাওড়ের কালো পানির দিকে তাকিয়ে আছে, এর বেশি সে কল্পনা করতে পারে না। ওরা দুজন দুরকম, ওদের বিয়ে হলে সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে। অনেক ভেবেছে সে, অনেক ভেবে সে এখানে বিয়ে করেছে। রুমীর কথা মনে হয় এখনো, বড় ভালো ছেলে, তাকে নিশ্চয়ই খুব ভুল বুঝেছে, কিন্তু কি করবে সে? রুমীর জন্যে সে তো ঠিক মেয়ে নয়, জীবন অনেক দীর্ঘ সময়, সেটা তো সে নষ্ট করতে পারে না, তার নিজেরটাও নয়, রুমীরটাও নয়।

ভদ্রলোকের নাম ডঃ আজহার আলী, বাঙালী, কিন্তু বিদেশেই থাকেন। দেশে এসেছিলেন, বেশিদিন থাকতে পারেননি, মোহভঙ্গ হয়ে ফিরে গেছেন। প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী দূর গ্যালাক্সীর আলো বিশ্লেষণ করে কিভাবে জানি মুক্ত কোয়ার্কের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। সারা পৃথিবীতে খুব হৈ-চৈ এ নিয়ে, রুমী নিজে নিউজ উইকে ভদ্রলোকের ছবি দেখেছে। ক'দিন আগে দেশে এসেছিলেন, সেমিনারে লোক আর ধরে না। হলের কমনরূমের টেলিভিশনে দেখেছে রুমী, বেশি বয়স না, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে হয়তো। বাংলা বলেন একটু অদ্ভুতভাবে, দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে বোধ করি এমন হয়েছে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

আদিল রহমান, মধ্যবয়স্ক কিন্তু এখনো প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। প্রযোজকরা কেউ তাকে ছবি তৈরি করার টাকা দিতে চায় না। নিজের সবকিছু বিক্রি করে ধারদেনা করে ছবি তৈরি করলেন, 'হাতছানি'। কোনো সিনেমা হল প্রথমে দেখাতে রাজি হলো না। একটিতে কোনরকমে এক সপ্তাহ টিকে থাকলো, লোকজন দেখতে পর্যন্ত গেল না। কাগজে কিন্তু খুব ভালো সমালোচনা বের হলো, বিজ্ঞ লোকেরা যথেষ্ট প্রশংসা করলেন, তুব সেই ছবি বাজার পেল না। লোকজন ভুলেই গিয়েছিল 'হাতছানির' কথা, বার্লিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেটা সর্বশ্রেষ্ঠ ছায়াছবি হিসেবে সে-বছর প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেল। শুধু তাই নয় এ ছবিরই পরিচালক এবং চরিত্রাভিনেতা শ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মান পেলেন। দেশে হৈ-চৈ পড়ে গেল, সব জায়গায় শুধু 'হাতছানির' গল্প। লোক ভেঙে পড়লো ছবি দেখতে। আদিল রহমান মাথা উঁচু করে দেশে ফিরে এলেন। তাঁকে নিয়ে কি মাতামাতি।

হৈ-চৈ কমে এলে আবার ছবি করতে চাইলেন ভদ্রলোক, প্রচণ্ড বাধা পেলেন আবার। স্টুডিওর লোকেরা সহযোগিতা করলো না, নায়ককে গুম করে ফেলার ভয় দেখানো হলো। ভদ্রলোকের বাড়িতে গ্রেনেড ফাটলো একদিন। আদিল রহমান সেই সপ্তাহেই স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে ইতালী চলে গেলেন। আর ফিরে আসেননি। সেখানকার কি একটা ফিল্মের স্কুলে নাকি পড়ান এখন।

শাজাহান সুজা, বয়স মাত্র ত্রিশ, তাঁর আঁকা তেল রঙের ছবি 'প্রিন্স' ওয়াশিংটন ডি. সি.-র মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে কিনে নিয়েছে। টাকাটা অবশ্যি শাজাহান সুজা পাননি, পেয়েছে অন্য লোক যার কাছে ছবিটা বিক্রি করেছিলেন তিনি। খুব প্রিয় ছবি ছিল তাঁর, নেহায়েত বিদেশে অর্থকষ্টে পড়েছিলেন বলে বিক্রি করেছিলেন ওটা। টাকা না পেলেও সম্মান ঠিকই পেয়েছিলেন। পৃথিবীর সব বড় বড় শিল্প সমালোচক প্রিন্সকে অসাধারণ কালজয়ী ছবি হিসেবে প্রশংসা করেছে। প্রিন্স ছবিটি কিন্তু খুব সাধারণ, কোনো নতুন টেকনিক বা স্টাইল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা নেই। বিমূর্ত ছবি নয়, ছবিতে সত্যি সত্যি প্রিন্স বা রাজপুত্রকে চেনা যাচ্ছে, ক্ষুধার্ত উলঙ্গ একটি শিশু উবু হয়ে বসে তাকিয়ে আছে, জ্বলজ্বলে চোখে। অতি সাধারণ ছবি ভালো একটা ক্যামেরা দিয়ে অনায়াসে এ রকম একটা ছবি তোলা যায় এদেশের পথেঘাটে। কিন্তু তবু ছবিটিতে কি যেন একটা রয়েছে, অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত নির্মম, অত্যন্ত নিষ্করুণ যা শুধু একজন শিল্পীই সৃষ্টি করতে পারে, ক্যামেরা পারে না। তাই সাধারণ ছবি হয়েও প্রিন্স অসাধারণ ছবি। যে-ই দেখেছে সে-ই স্বীকার করেছে এটা শুধু ছবি নয়, এটা গোটা পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের ইতিহাস।

শাজাহান সুজা তাঁর সম্মান নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। রুমী অপেক্ষা করছিল কবে নাগাদ চলে যান দেখার জন্যে। এ দেশে কেউ থাকে না, কোনকিছুতে একটু ভালো হলেই লোকজন এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। শাজাহান সুজা বড় শিল্পী, তাঁর থাকার তো কোনো কারণই নেই। তবু তিনি থেকে গেলেন। চুপচাপ লোক, এখনো বিয়ে করেননি। অনেক মেয়ের গোপন দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘতর করে শাজাহান সুজা ক্যামেরা নিয়ে তাঁর লাল রঙের গাড়ি করে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়ান। রুমী খুব পছন্দ করে তাঁকে, সুযোগ পেলে একবার

www.MurchOna.com

কথা বলে দেখবে, এতো বিখ্যাত লোক সুযোগ পাবে কিনা সেটাই সন্দেহ। দেশের জন্যে রুমীর খুব মমতা, দেশের বড় বড় লোকজন যদি ফিরে আসে তাহলে দেশের লোককে আসা দেয়া যায়। না হলে তারা কাকে দেখে মুগ্ধ হবে, আশা পাবে? যোগ্য মানুষ এ দেশে অনেক আছে, কিন্তু তারা স্বীকৃতি পায় না যতদিন না পাশ্চাত্য দেশ তাদের স্বীকৃতি দেয়। এ নিয়ে রুমীর দুঃখটা আন্তরিক।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যাপারটা অনেকের চোখে পড়লো। গত কয়েক মাসে অন্তত চারটি শিশু অস্বাভাবিক ভাবে মারা গেছে। প্রথমে সবাই ভেবেছিল বুঝি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু তিনমাসের মাথায় দেখা গেল এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ব্যাপারটা বুঝতে তিনমাস সময় লাগার আরও একটা কারণ আছে। যে সমস্ত শিশুরা এই সময়ে মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে তারা সবাই গরীবের সন্তান, রাস্তাঘাট··· বড়জোর বস্তিতে থাকে। তাদের বেঁচে থাকাটাই বিস্ময়, তাই হঠাৎ করে মারা গেলে কেউ অবাক হয় না, মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ সভ্য লোকজনের কান পর্যন্ত পৌঁছোয় না। কিন্তু ঢাকা শহরে তিনমাসে অন্তত চারটি শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু, দুজন নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ একটু বাড়াবাড়ি, তা সে যতো গরীবের সন্তানই হোক। প্রথম প্রথম শিশুগুলির মৃতদেহ পোস্টমর্টেম পর্যন্ত করা হয়নি। তৃতীয় শিশুটির বেলায় একটু হৈ-চৈ হলে তাকে পোস্টমর্টেম করে দেখা গেল তাকে বিষ প্রয়োগে মারা হয়েছে। চতুর্থ শিশুটিকে মারা হয়েছে গলা টিপে। শহরে এবার কিছুটা হৈ-চৈ পড়ে গেল, খবরের কাগজে লেখালেখি হলো, সমাজ ব্যবস্থাকে একচোখা বলে গালি দেয়া হলো, কিন্তু সুরাহা হলো না ব্যাপারটার। নওয়াবপুর রোডে আধপাগল গোছের একজন লোক একটা বাচ্চাকে আদর করতে গিয়ে খামোকা প্রচণ্ড মার খেলো একদিন। শহরের মা-বাবারা সতর্ক হয়ে গেলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে আর চোখের আড়াল করতে চান না। কিন্তু যে ধরনের ছেলেমেয়েরা মারা যাচ্ছিলো সেই সব পথের শিশুরা ঠিকই পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তাদের বেঁচে থাকতে হলে ঘুরে বেড়াতে হয়, এখানে সেখানে ছোটখাট কাজ, ভিক্ষা ও চুরিচামারি করে বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে হয়। তাদের ঘর নেই, বন্ধ হয়ে থাকবেই বা কোথায়?

ব্যাপারটা নিয়ে হৈ-চৈ হওয়ার পর প্রায় মাসখানেক কিছু ঘটলো না। একজন দুজন নিখোঁজ হয়েছে হয়তো, কিন্তু পথের ছেলেমেয়েরা কখন সত্যিই নিখোঁজ হয়েছে, আর কখন নিজেই কোথায় চলে গিয়েছে ঠিক করে বলা মুশকিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে আবার সবার টনক নড়লো, চার বছরের একটা শিশুকে প্রকাশ্য রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। নির্মমভাবে তাকে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করে মারা হয়েছে। যখন তাকে পাওয়া গেছে তখনো তার মৃতদেহ শীতল হয়ে যায়নি। মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি থেকে যেটা বড় সেটা হচ্ছে ভীতি। কি ভয়ানক ভীতি, মৃত্যুর মুখোমুখি হলেই বুঝি এরকম ভীতি সম্ভব।

সারা শহরে এবার হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। অনেকে এবার সত্যি সত্যি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। রাজনৈতিক দলগুলি মাইক নিয়ে বস্তিতে বস্তিতে সবাইকে সচেতন করার জন্যে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে দেয়া হলো কখনো যেন তারা অপরিচিত কারো কাছে না যায়, অপরিচিত লোকদের দেয়া কিছু না খায়, কখনো যেন

একা হাঁটাহাঁটি না করে, রাতে কখনো পথেঘাটে ঘুরোঘুরি না করে, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই যেন বয়স্ক কাউকে বা পুলিসকে জানায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বয়স্কাউট আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরা তাদের অফিস খুলে রাতে পাহারা দেয়া শুরু করলো।

কিন্তু তবু ব্যাপারটি বন্ধ হলো না, প্রায় নিয়মিত ভাবে দুই থেকে তিন সপ্তাহের ভেতর একটা করে শিশু নিখোঁজ হতে লাগলো। সব সময়েই যে শিশুগুলির মৃতদেহ পাওয়া যেতো তা নয়, কিন্তু যে একবার নিখোঁজ হয়েছে সে আর কখনো ঘুরে আসতো না, তা থেকে সবাই প্রায় নিঃসন্দেহ হতো যে তাদেরও মেরে ফেলা হয়েছে। আরও নিঃসন্দেহ হওয়া গেল কারণ ক'দিন পরেই সাভারের কাছে একটা ডোবায় একজন চারটে মৃতদেহ আবিষ্কার করলো। সবই বাচ্চাদের দেহ, দীর্ঘ দিনে সেগুলি বিকৃত হয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে কাউকে চেনার উপায় নেই। পুলিস অনেকদিন খবরটা চেপে রেখে সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা গোপন পাহারার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি, হত্যাকারী সেখানে আর কখনো ফিরে আসেনি।

চেষ্টার অবশ্যি কোনো ত্রুটি ছিল না। দিন রাত অসংখ্য পুলিস সাদা পোশাকে সারা শহরে ছড়িয়ে থাকতো। শিশুর মৃতদেহে হাতের ছাপ বা অন্যান্য চিহ্ন খুঁজে বের করার জন্যে মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনে আনা হলো। ফরেনসিক এক্সপার্ট একজনের ট্রেনিং বাতিল করিয়ে দিয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হলো। একদিন কারফিউ দিয়ে মিলিটারী আর পুলিস সারা শহর তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করলো। কেউ হত্যাকারী সম্পর্কে কোনো খোঁজ দিতে পারলে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হলো। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সে-টাকা ক'দিনের ভেতর বাড়িয়ে এক লাখ করে দিল, কিন্তু তবু কোনো লাভ হলো না। টাকার লোভে আজকাল লোকজন অনেক ঘন ঘন খবর নিয়ে আসে, কিন্তু সব খবরই ভিত্তিহীন। দেখতে দেখতে পাঁচ মাস হয়ে গেল, তবু ঘটনার কোনো কিনারা হলো না।

দুঃস্থ শিশুদের পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করার জন্যে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা নেয়া হলো। শহরের বড় বড় বস্তিতে ছোট শিশুদের জন্য লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করা হলো। প্রচুর টাকার প্রয়োজন, সবাই নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা করলো। সরকারী বেসরকারী কর্মচারীরা তাদের একদিনের বেতন দান করলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে লোকজনের কাছ থেকে টাকা তুলতে লাগলো। বড় বড় শিল্পীরা গানের আসর করলেন, অনেক মোটা টাকায় টিকিট বিক্রি করে পুরো টাকাটা শিশুদের জন্যে দান করা হলো। শাজাহান সুজা তাঁর ছবির প্রদর্শনী করলেন, প্রদর্শনী শেষে ছবিগুলি নিলামে বিক্রি করা হলো। স্থানীয় বিদেশীরা অবিশ্বাস্য দাম দিয়ে ছবিগুলি কিনে নিল, শাজাহান সুজার ছবি কিনলে নাকি টাকা খরচ করা হয় না, টাকা খাটানো হয়, ক'দিন পরে ছবিগুলি হয়তো লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হবে। ছবি প্রদর্শনী থেকে অনেক টাকা উঠলো, পুরো টাকাটাই শাজাহান সুজা শিশুদের জন্যে দিয়ে দিলেন।

দরজায় টোকা শুনে উঠে দরজা খুলে দেয় রুমী, বাইরে পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ ওর ভেতরটা চমকে ওঠে। হলে আশেপাশের দরজা থেকে অনেক ছেলে উঁকি দিয়ে দেখছে, পুলিস এ সমাজে খুব ভয়াবহ জীব। পুলিস অফিসার হাত বাড়ালেন, চিনতে পারছেন?

www.MurchOna.com

চিনতে পারলো রুমী, এক রাত হাজত বাসের সময় এই পুলিস অফিসার তাকে জেরা করেছিলেন, তাকে অবিশ্বাস করে হাজতে পুরেছিলেন আবার তার কথা সত্যি হওয়ার পর নিজে গিয়ে লকআপ খুলে বের করে এনেছিলেন। রুমী হাত বাড়িয়ে বললো, চিনতে পারবো না! এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাবো! আমার জীবনের প্রথম হাজত বাস!

ভদ্রলোক জোরে জোরে হাসলেন, তাই শুনে আশেপাশের সবাই বুঝলো ভয়ের কিছু নেই, যে যার নিজের কাজে ফিরে গেল। ভদ্রলোক রুমীর সাথে তার ঘরে ঢুকে এদিক সেদিক তাকালেন। চমৎকার ঘর, চমৎকার দৃশ্য ইত্যাদি বলে রুমীকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে আরেকটা ধরিয়ে কাজের কথায় চলে এলেন। রুমী বুঝতে পেরেছে কি জন্যে এসেছেন, তবু নিজের কানে শোনার জন্যে অপেক্ষা করে রইলো।

মনে আছে আপনি হাজতে বসে আশফাক হাসানের কেসটা কিভাবে বলে দিয়েছিলেন?

মাথা নাড়ে রুমী।

আমি নিজে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। অবিশ্বাস্য!

চুপ করে থাকে রুমী। ভদ্রলোক একটু নিচু গলায় বললেন, আপনাকে আবার সাহায্য করতে হবে।

রুমী নড়েচড়ে বসে বলে, কি সাহায্য?

পুলিস ডিপার্টমেন্ট কিছুতেই বাচ্চাদের মার্ডারারকে ধরতে পারছে না। কোনদিকে এতটুকু চিহ্ন নেই। এতো চেষ্টা করা হচ্ছে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। আপনি যদি আগের মতো বলে দেয়ার চেষ্টা করেন, জাস্ট একটু ধরিয়ে দেবেন, কোন ধরনের ক্লু, জাস্ট ছোট একটা ক্লু...

রুমী আস্তে আস্তে বলে, আমি পারলে সত্যি বলতাম। আপনি না এলেও আমি চেষ্টা করতাম। ঠাট্টা করে বলে, অন্তত টাকাটার লোভে চেষ্টা করতাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আজ তিন বছর ধরে আমি আর পারি না। একেবারেই পারি না।

ভদ্রলোকের খুব আশাভঙ্গ হলো। মরিয়া হয়ে লুকিয়ে রুমীর কাছে এসেছিলেন তিনি। শিশু হত্যাকারীকে ধরার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিসের ডি. আই. জি. নিজে নাকি সব কজন পীরের কাছে গিয়ে ধর্না দিয়েছেন, কোনো লাভ হয়নি।

ভদ্রলোক যাবার সময় রুমীকে নিজের নাম আর ফোন নাম্বার দিয়ে গেলেন। যদি কোনভাবে কোনরকম হদিস পায় তাকে জানাতে যেন দ্বিধা না করে।

রুমী সে-রাতে অনেকক্ষণ ভাবলো ব্যাপারটা। তার যে কথাটা আগে মনে হয়নি তা নয়, এমন কি কিবরিয়া ভাইও একবার তাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পুরস্কারের টাকাটা এক লাখ হয়ে যাবার পর তার নিজেরও প্রচণ্ড লোভ হয়েছিল। তবু কিছুতেই সেই অন্ধকার জগতে ফিরে যেতে চায় না রুমী। যাদের অভিজ্ঞতা হয়নি তারা কোনদিন ওর ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। এটা অনেকটা চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো, ড্রাইভার ট্রেনের ব্রেক কষে থামাতে পারবে কিনা জানা নেই। যতোবার ঐ ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে ততোবারই সে তার ভেতর থেকে ফিরে আসতে পারবে বলে

www.MurchOna.com

ভাবতে পারেনি। ব্যাপারটা এখন অতীত, তবু ওর বুকের ভেতর ভয়টুকু রয়ে গেছে, প্রচণ্ড অশরীরী ভয়, সেভয়ের রাজ্যে আর ফিরে যেতে চায় না রুমী।

ঘুরেফিরে একসময়ের সর্বনাশা ক্ষমতার কথা মনে হতে থাকে ওর। শিশু হত্যাকারীদের ওপর সবার মতো সে নিজেও এমন বিরক্ত হয়ে উঠেছে যে বলার নয়, আরও কিছুদিন এরকম চললে ও সত্যিই চেষ্টা করে দেখবে হত্যাকারীর মনের ভেতর প্রবেশ করা যায় কিনা। এখন সে তা পারে না, ক্ষমতাটা শেষ হয়ে গেছে, তবু চেষ্টা করাটা ওর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে জানে হয়তো তার ভেতরে কোথাও এখনো ক্ষমতাটা লুকিয়ে আছে, চেষ্টা করলেই বের হয়ে আসবে। তাই যদি হয়, তবে শিশুগুলির মৃত্যুর জন্যে সে-ও খানিকটা দায়ী হবে।

চিৎকার করে উঠে বসে রুমী। স্বপ্নে দেখেছে ছোট একটা শিশু প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আর্তনাদ করছে। যন্ত্রণায় ওর সারা মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখতে দেখতে ছোপ ছোপ রক্তে ওর মুখ ভরে উঠছে। শিশুটি তখনো চিৎকার করে যাচ্ছে, অসহায় ব্যাকুল চিৎকার, দেখে বুক ফেটে যেতে চায়।

ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে রুমী, দরদর করে ঘামছে সে, বুকের ভেতর ধক্ ধক্ করছে। কি ভয়ানক। ইশ! কি ভয়ানক স্বপ্ন!

রুমীর বুকের ভেতর বহু পুরোনো চাপা একটা ভয় বাসা বাঁধতে থাকে, ও জানে এটা শুধু স্বপ্ন নয়—স্বপ্নের থেকে অনেক বেশি।

পরদিন ভোরে খবরের কাগজে বড় বড় করে লেখা হলো, আরও একটি হতভাগ্য শিশু। পাশেই শিশুটির রক্তাক্ত ছবি। রুমী চিনতে পারলো একেই সে দেখেছে গতরাতে।

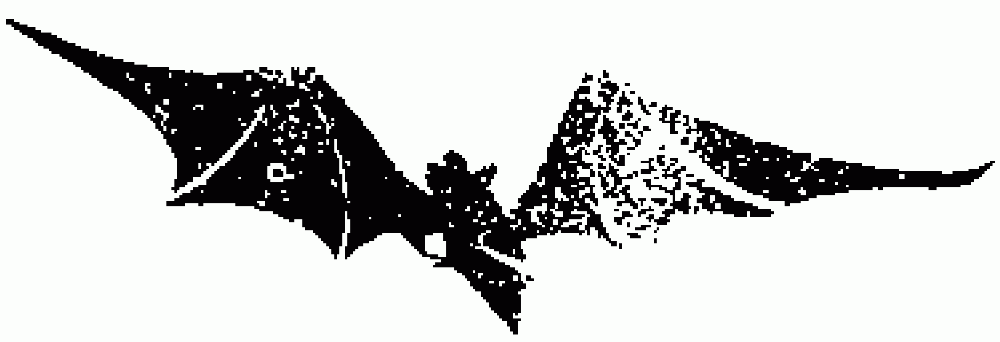

নয়

সারাদিন ধরে প্রস্তুতি নিল রুমী, আজ রাতে সে শিশু হত্যাকারীকে খোঁজার চেষ্টা করবে। আগে কখনো এ ধরনের চেষ্টা করেনি ও, পারবে কিনা তাও জানে না, কিন্তু আগের রাতে সেই হতভাগ্য শিশুটিকে দেখার পর ওর মনে হয় ব্যাপারটা সম্ভব হতেও পারে। ওর প্রস্তুতির বেশির ভাগই মানসিক। শানুকে একটা লম্বা চিঠি লিখলো, অনেক দিন দেখা হয় না, সময় পেলেই বেড়াতে যাবে, ভাগনেরা সব কেমন আছে—এই ধরনের কথাবার্তা। দুপুরে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরলো সে। খাওয়ার পর ভালো এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনলো দোকান থেকে। লাইব্রেরির ক'টা বই ছিল তার কাছে, সব সময়ে পাওয়া যায় না অনেক কষ্টে পেয়েছে সে, তবু সেগুলি কি ভেবে ফেরত দিয়ে এলো। একটা ছেলের কাছ থেকে দশ টাকা ধার করেছিল সেদিন, টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে এলো। পুলিস অফিসারকে জানাবে কিনা ভেবে না পেয়ে, না জানানোই ঠিক করলো। রাতে যদি ওর কিছু একটা হয়ে যায় সেটা ওর পাশের রুমের ছেলেটি জানতে পারবে। আজকাল ভোরে নাস্তা করতে যাওয়ার সময় রোজ তাকে ডেকে নিয়ে যায়।

সন্ধে হয়ে এলে বুকের ভেতর যেন কেমন করতে থাকে রুমীর। কে জানে শেষ পর্যন্ত কিছু হবে কিনা। সে একটু পর পর নিজের মনের ভেতর খুঁজে দেখে অশুভ কোনো অনুভূতি জেগে উঠছে কিনা। আজ সারাদিনই ওর বুকে একটা চাপা ভয়, সবকিছুকেই ওর অশুভ মনে হয়।

একটু সকাল সকাল খেয়ে নেয় রুমী। কারো সাথে কথা না বলে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। বাতি নেভানোর আগে একটা সিগারেট ধরায়, অন্ধকারে সিগারেট খেয়ে সে মজা পায় না। কোনরকমে সিগারেট শেষ করে বাতি নিভিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে। বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শিশুগুলির কথা ভাবতে থাকে সে। যে মানুষ এরকম অবোধ শিশুদের মারতে পারে সে না জানি কিরকম। কে জানে হয়তো এটাও কোনো ধরনের প্রেত-সাধনা—রুমীর বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। সাথে সাথেই তার টুপি মাথায় সেই বৃদ্ধটির কথা মনে পড়ে, সে তাকে বুঝিয়েছিল মানুষের ভেতর কত ক্ষমতা আছে তা সে জানে না, জানলে পৃথিবী অন্যরকম হয়ে যেতো। সে নিজেকে সাহস দেয় অতীতে যা ঘটেছে তা অতীতেই থাকবে, ভবিষ্যতে আর ঘটতে দেবে না।

…লুসি ইন দা স্কাই…ডায়মন …হঠাৎ করে রুমীর ভেতরে একটা ইংরেজী গানের সুর ভেসে ওঠে। মুহূর্তে সোজা হয়ে বসে রুমী। কেউ একজন গান গাইছে। কে লোকটা? হঠাৎ গান বন্ধ হয়ে তীব্র গালাগালি শুরু হয়ে যায়, সে-ভাষা বুঝতে পারে না রুমী কিন্তু অনুভূতিটা বুঝতে পারে। প্রচণ্ড ঘৃণা কারো ওপর, প্রচণ্ড ঘৃণা। চোখ বন্ধ করে দেখার চেষ্টা করে রুমী, কিছু দেখতে পায় না। সমস্ত মনপ্রাণ একত্র করে সে চেষ্টা করতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো ছবি ভেসে ওঠে, কিন্তু তেমন পরিষ্কার হয় না। মনে হচ্ছে সে দ্রুত ভেসে যাচ্ছে, যেন হাওয়ায় ভর করে—একটা দোকান, একটা লাইট পোস্ট, ঠেলা গাড়িতে শুয়ে আছে একজন….আবার অন্ধকার।

...আর একটা হলেই হয়। শালারা এতো সাবধান হয়ে গেছে। আবার অশ্রাব্য গালি, এবারে বাংলায়। রুমী বুঝতে পারে লোকটা ছোট বাচ্চার কথা বলছে। সে ঠিক লোকটাকেই পেয়েছে। এতোক্ষণ ভাবছিল বিদেশী, কিন্তু না বিদেশী নয়। সারা মনপ্রাণ একত্র করে মানুষটার ভেতরে মিশে যাবার চেষ্টা করে রুমী পারে না, বারবার লোকটা ওর কাছ থেকে যেন ফস্‌কে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সে হাল ছাড়ে না, প্রচণ্ড একাগ্রতা নিয়ে পেছনে লেগে থাকে।

আস্তে আস্তে লোকটাকে অনুভব করতে পারে সে, দেখতে পায় লোকটার চোখ দিয়ে, ভাবনাগুলি জানতে পারে। গাড়ি চালাচ্ছে রুমী, চোখ দুটি ঘুরছে রাস্তার দুপাশে, ছোট শিশু খুঁজছে সে। আপন মনে গান গাইছে, লুসি ইন দা স্কাই উইথ ডায়মণ্ড, ঘুরেফিরে একটা লাইনই গাইছে সে অনেকক্ষণ ধরে। কি গান এটা? লোকটাকে দেখতে পায় না ও, তার চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখে, কিন্তু তাতে লাভ কি? লোকটাকে ওর দেখা দরকার।

পারলো না রুমী, হঠাৎ করে সে লোকটার অনুভূতি হারিয়ে ফেললো। কিছুক্ষণ লাগলো ওর বুঝতে ও কোথায় আছে। নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করে, আগে কখনো সে এত ক্লান্তি অনুভব করেনি। কে জানে, জোর করে চেষ্টা করছে বলেই হয়তো এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু ওর বুকের ভেতরটা হালকা হয়ে যায়। লোকটাকে পেয়েছে সে, এবারে তার পরিচয় বের করতে হবে। লোকটার গাড়ি আছে, অন্ধকারে বোঝা যায় না কি রঙ। বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারে সে, ইংরেজী গান গায় লুসি ইন দা স্কাইন না কি যেন। কি গান এটা? বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না রুমী, মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ে সে।

পরদিন ফোন করে পুলিস অফিসারকে পেল না রুমী, কি কাজে জানি রাজশাহী গেছেন, দুদিন পর ফিরে আসবেন। একটু আশাভঙ্গ হলো তার, ভদ্রলোক শুনলে খুশি হতেন। অবশ্যি এখন পর্যন্ত সে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি, লোকটা কোথায় থাকে বের করতে হবে, কি রকম চেহারা কি নাম সব জানতে হবে।

রাত গভীর হয়েছে। লোকটা আবার গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে। লাল রঙের গাড়ি রুমী দেখতে পেয়েছে আজ। লোকটা গাড়ি চালায় খুব বেপরোয়াভাবে। প্রতিবার একটা রিকশা পার হয় আর কুৎসিত গালি দেয় রিকশাওয়ালাকে। লোকটা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে একটা বাচ্চার জন্যে, অপেক্ষা করতে পারছে না আর। গান গাইতেও মনে নেই, চোখ দুটো শুধু নড়ছে দুই পাশে।

কি একটা কাজ আটকে আছে ওর, রুমী অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারলো না। একটা বাচ্চা না পেলে সে কাজটা শেষ করতে পারছে না। অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিচ্ছে বাচ্চাদের, মানুষ বলেই ভাবে না, কুকুর বেড়ালের মতো দেখে সে ওদের। জীবন সার্থক করে দিচ্ছে সে শিশু গুলির, সেজন্যে ওদের খুশি হওয়া উচিত। মরে তো এমনিতেই শেষ হবে, একটা কাজে লাগলে ক্ষতি কি?

তৃতীয় রাত। ঘরের বাইরে গেল না রুমী, অন্ধকার ঘরে বসে মদ খেলো সারাক্ষণ। মন মেজাজ খুব খারাপ, মদ খেয়ে আরও খারাপ হয়ে গেল। বাসর ঘরে টেলিফোন বেজেই চললো, সে গিয়ে ধরলো না পর্যন্ত।

চতুর্থ রাত। কি আনন্দ। কি আনন্দ। বাচ্চা পেয়েছে সে একটা, ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে এখন। কাল ভোর থেকেই কাজ শুরু করে দেবে। অনেকদূর যেতে হয়েছে আজ, শহরের সবাই এতো সাবধান হয়ে গেছে যে বলার নয়। তার এতগুলি কায়দা ছিল বাচ্চা ধরে আনার তবু কোনটাই কাজে লাগছে না আজকাল। দূরে গ্রামের দিকে শিশুগুলি এখনো সাবধান হয়নি, সেখান থেকেই ধরে এনেছে সে। সবার এটা নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করার দরকার কি সে বুঝতে পারে না। সে তো খারাপ কিছু করছে না, বাচ্চাগুলি তো এমনিতেই মরে ভূত হয়ে যেতো, এখন তবু একটা কাজে লাগছে। লোকটা হালকা সুরে গান গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। বাথরুমে গেল, রুমী প্রস্তুত হয়ে নিল সাথে সাথে, বাথরুমে আয়নায় চেহারা ভালো করে দেখে নিয়ে মনে রাখতে হবে। চেহারার থেকে বেশি দরকার লোকটার পরিচয়, বাসার ঠিকানা।

বাথরুমে বাতি জ্বালিয়ে লোকটা আয়নার দিকে তাকালো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিজেকে দেখছে।

লোকটাকে আগে দেখেছে রুমী, কিন্তু মনে করতে পারছে না কোথায় দেখেছে। কে? কে লোকটা? কে?

হঠাৎ চিনতে পারে রুমী, হতবাক হয়ে যায়, শাজাহান সুজা!

পুলিস অফিসার গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন, আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে এখন।

রুমী জোর দিয়ে বললো, আমি স্পষ্ট দেখেছি শাজাহান সুজাকে। আমি ওকে ভালো করে চিনি, ওর একটা লাল গাড়িও আছে।

কিন্তু ওর বাসায় আমি কিছু পাইনি, বললেন পুলিস অফিসার। সবকিছু তন্নতন্ন করে দেখেছি। ভীষণ খেপেছে শাজাহান সুজা, ডি. আই. জি.কে ফোন করেছে, এখন আমার চাকরি যাবার দশা।

রুমী মাথা নেড়ে বললো, আমি স্পষ্ট দেখেছি, বিশ্বাস করুন আমাকে।

কিন্তু কি করবে ও বাচ্চাকে মেরে?

জানি না। কি একটা খুব নাকি জরুরী দরকার। কি কাজ কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

পুলিস অফিসার মুখ গম্ভীর করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একটু পরে বললেন, হয়তো এতদিন পরে আপনার ক্ষমতাটা কমে আসছে, ঠিক করে বলতে পারছেন না আজকাল···

উত্তেজিত হয়ে বাধা দেয় রুমী, কক্ষণো না। আমি ঠিক বুঝতে পারি কখন কি হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা। শাজাহান সুজাকে হাতেনাতে ধরতে না পারলে কিছুতেই প্রমাণ করা যাবে না। আপনার কথার ওপর ভরসা করে ওকে তো অ্যারেস্ট করতে পারি না।

রুমী এবারে রেগে ওঠে। চেষ্টা করে রাগটা চেপে রাখতে, তবু ওর গলার স্বরে সেটা প্রকাশ হয়ে যায়, আপনিই নিজে গিয়ে আমাকে অনুরোধ করলেন একটা কিছু আভাস দিতে। এখন আমি বলে দিচ্ছি লোকটা কে তবু আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

www.MurchOna.com

বিশ্বাস করছি না কে বললো? ভদ্রলোক বাধা দিলেন, আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে শাজাহান সুজাকে চোখে চোখে রাখলেই সে ধরা পড়বে।

কতদিন চোখে চোখে রাখবেন?

যতদিন সে আবার একটা কিছু না করছে।

মানে? আর সে যে আরেকটা বাচ্চা ধরে এনেছে। তাকে যদি...

আমি ওর বাসা দেখেছি, কোনো বাচ্চা নেই।

আমি বলছি আছে, আমাকে নিয়ে চলুন।

তা হয় না। ভদ্রলোক নরম গলায় বললেন, শাজাহান সুজা খুব ক্ষমতাশালী লোক। আপনি বুঝবেন না, ওকে হাতেনাতে ধরলেও ওর নামে কেস করা খুব মুশকিল হবে।

আস্তে আস্তে বললো রুমী, তার মানে আপনি ঐ বাচ্চাটাকে শাজাহান সুজার হাতে মরতে দেবেন?

ভদ্রলোক দুর্বল গলায় বললেন, ওর বাসায় কোনো বাচ্চা নেই।

রুমী টেবিলে কিল মেরে বললো, একশোবার আছে। কাল পরশু যখন বাচ্চাটাকে রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে দেখবেন তখন বিশ্বাস করবেন।

অমাদের ঐ একটা চান্স। আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে শাজাহান সুজাকে কোথাও না কোথাও মৃতদেহটা ফেলতে হবে। তখন হাতেনাতে ধরে...

রুমী লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, চিৎকার করে বলে, তার মানে ঐ ছেলেটাকে জান দিতে হবে ওকে ধরার জন্যে, আপনারা জেনেশুনে শিশুটিকে মরতে দিচ্ছেন?

ব্যস্ত হবেন না, আমার কথা শুনুন। ভদ্রলোক রুমীকে হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা এইভাবে দেখুন, ছেলেটা হয়তো মারা যাবে, তবু আমরা ওকে ধরতে পারবো, এছাড়া তাকে ধরার আর কোনো উপায় নেই। আপনার কথা শুধু আমিই বিশ্বাস করছি, অন্য কেউ বিশ্বাস করবে না। শুধু তাই নয় আপনি যদি অন্য কাউকে এটা বলতে যান, আপনি নিজে সমস্যায় পড়ে যাবেন। শাজাহান সুজা ছলিমদ্দি, কলিমদ্দি না, শাজাহান সুজা হচ্ছে শাজাহান সুজা, দেশের সম্পদ। ওই বাচ্চাটা মারা গিয়ে হয়তো আরও দশটা বাচ্চার জান বাঁচাবে।

মাথা নাড়ে রুমী, আমি কিছুতেই আপনার কথা মানতে পারবো না। এক হাজার পুলিস দিয়ে ওর বাড়ি ঘেরাও করুন, হারামজাদাকে ধরে গরুর মতো পিটিয়ে ওর মুখ থেকে কথা বের করুন...

আপনি এখনো অনেক ছেলেমানুষ। দুনিয়া বড় কঠিন জায়গা। পকেটমারকে ধরে পেটানো যায়, যদিও সে পকেট মারছে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর জন্যে। শাজাহান সুজারাও ছাড়া পেয়ে যায়, যদিও খুন করছে নিছক আনন্দের জন্যে।

ঠিক তক্ষুণি একটা টেলিফোন এলো। রুমী পুলিস অফিসারের কথা শুনে বুঝতে পারে শাজাহান সুজার বাসায় গিয়েছিলেন বলে কৈফিয়ত তলব করা হচ্ছে। খবরের কাগজে খবর চলে গিয়েছে, কাল ভোরে পুলিস ডিপার্টমেন্টের মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। ভদ্রলোক মুখ কালো করে শুনে গেলেন। কোন্ খবরের ওপর ভরসা করে শাজাহান সুজার বাসায় গিয়েছিলেন বলার উপায় নেই। আমতা আমতা করে বললেন, সাভারের রাস্তায় একটা লাল গাড়ি দেখা গিয়েছিল, শাজাহান সুজার গাড়িও লাল...

www.MurchOna.com

ফোনের অন্য পাশ থেকে একটা অট্টহাসির মতো শব্দ ভেসে এলো। রুমী প্রায় দু'হাত দূরে বসে স্পষ্ট শুনলো ওপাশ থেকে বলছে, তাহলে ফায়ার ব্রিগেডের লোকজনকে অ্যারেস্ট করো না কেন? ওদের গাড়িও তো লাল।

ভদ্রলোক ফোন রেখে বললেন, আজ কালের ভেতর এটার কোনো কিনারা না হলে আমার গারো পাহাড়ে পোস্টিং হয়ে যাবে।

ক্ষুব্ধ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো রুমী, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে সেও খানিকটা বুঝতে পেরেছে কেন এখন শাজাহান সুজাকে ধরার উপায় নেই। ওর মনে পড়ে প্রেত উপাসকের দলেরা হাতেনাতে ধরা পড়েও শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। তবুও চুপচাপ একটা শিশুকে মরতে দিতে কিছুতেই ওর মন সায় দিচ্ছে না।

রুমী খেয়াল করেনি কখন সে হাঁটতে হাঁটতে শাজাহান সুজার বাড়ির কাছে চলে এসেছে। সম্ভ্রান্ত এলাকা, ঝকঝকে বাসাগুলি আশ্চর্য রকম চুপচাপ। প্রায় বাসাতেই বড় বড় কুকুর, ঘেউ ঘেউ করে ঐশ্বর্যের কথা জানিয়ে দেয়।

শাজাহান সুজার বাড়িটি একতালা, ছিমছাম। বাইরে বড় লোহার গেট, সেখানে মস্ত তালা ঝুলছে। একমুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো রুমি । কে জানে হয়তো এর ভেতর এখন শাজাহান সুজা বাচ্চাটিকে হত্যা করছে। ভাবতে ভাবতে একটা শিশুর তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল রুমী। চমকে ঘুরে তাকায় সে, কেউ নেই। চিৎকারটি সে শুনতে পায়নি, অনুভব করেছে। কিন্তু এত স্পষ্ট আর জীবন্ত অনুভূতি এর আগে কখনো হয়নি।

চলে যাচ্ছিল রুমী, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। শাজাহান সুজার গলা শুনতে পেল সে, দেখি কত সহ্য করতে পারিস হারামজাদা! রুমীর মনে হলো ওর কানের কাছে চিৎকার করে বলছে শাজাহান সুজা। এত জীবন্ত গলার স্বর যে রুমীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আবার শাজাহান সুজার হিংস্র চিৎকার শুনতে পেল রুমী, আর সাথে সাথে একটা শিশুর প্রাণফাটা আর্তনাদ। রুমীর চোখের সামনে একটা শিশুর রক্তমাখা মুখ একমুহূর্তের জন্যে ভেসে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটতে থাকে সে, আর সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ছুটে গিয়েও রেহাই পায় না সে, শিশুটার প্রাণফাটা আর্তনাদ তাকে তাড়া করতে থাকে। পাগলের মতো ছুটতে থাকে রুমী, আর কি ভাগ্য তখনি খালি রিকশা পেয়ে যায়। কোনমতে উঠে বলে, তাড়াতাড়ি চলো।

কোথায়?

যেখানে খুশি। রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে প্রাণপণে রিকশা ছুটিয়ে চলে।

অনেকক্ষণ পর সংবিৎ ফিরে পায় রুমী। অনেক ঘুরে ফিরে সে হলের কাছে এসে পৌঁছেছে। বাচ্চাটার আর্তনাদ আর সে শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু তাতে লাভ কি? সে ভুলবে কি করে?

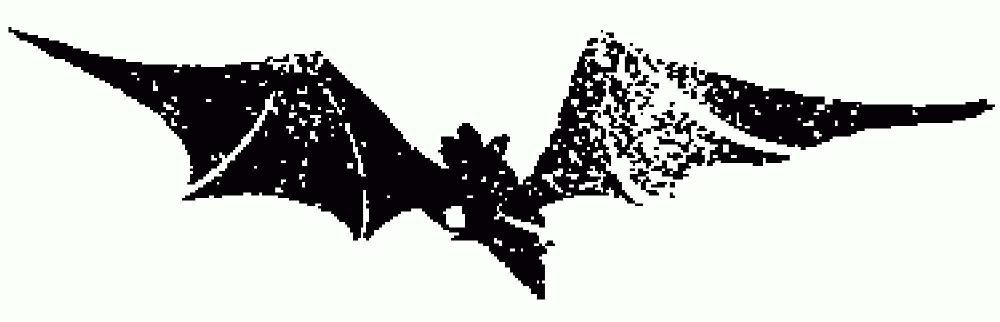

www.MurchOna.com

দশ

সারা বিকেল সে চুপচাপ বসে ভেবেছে। ঘুরেফিরে বারবার ওর তিন বছর আগের সেই টুপি মাথায় শান্ত মতন বুড়ো লোকটার কথা মনে পড়েছে। তাকে বলেছিল, বাবা, তোমার সাহস থাকলে বলতাম তুমি ঐসব লোকদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। তখন তার সাহস ছিল না, যে কোনভাবে এই যন্ত্রণাদায়ক ক্ষমতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন অন্য ব্যাপার, সে নিজেই এখন তার ভেতর সেই পুরোনো ক্ষমতা জাগিয়ে তুলেছে। এবারে সে চেষ্টা করে দেখতে পারে না? শাজাহান সুজাকে একটা শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে পারে না? এতে শিশুদের আত্মা যদি একটু শান্তি পায়, সেটুকুই লাভ।

কথাটা যতোই ভাবে ততোই তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে। আস্তে আস্তে নিজের ভেতরে একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব অনুভব করে সে। সন্ধ্যায় খেতে বসে থেকে থেকে তার মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে কেমন একটা কঠোর ভাব ফুটে ওঠে। সামনের চেয়ারে পরিচিত ছেলেটি রুমীকে দেখে অবাক হয়ে বললো, কি রে রুমী, কি হয়েছে তোর?

মুহূর্তে মুখের মাংসপেশী শিথিল করে হেসে বললো, না কিছু না।

মুখ এমন করে রেখেছিস যেন কাউকে মারবি।

একটু হাসলো রুমী, কাকে মারবে? ও কি জানে মারলে তার কি শাস্তি হবে?

শান্ত হয়ে নিজের ঘরে বিছানায় বসে আছে রুমী। ঘরের বাতি বন্ধ, খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে। আজকাল তার আর ভয় হয় না, নিজের ক্ষমতার ওপর একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে। অবশ্যি আজ দুপুরে সে যখন শাজাহান সুজার বাসার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তখন তার নিজের ইচ্ছার ওপর কোনো হাত ছিল না। সে শাজাহান সুজার হিংস্র চিৎকার আর বাচ্চাটির আর্তনাদ কিছুই শুনতে চাচ্ছিল না। তবু তাকে শুনতে হয়েছে। পুরো অনুভূতিটা এতো তীব্র আর এতো জীবন্ত ছিল যে তার সহ্য করা পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। কে জানে খুব কাছাকাছি থাকলে হয়তো এরকম তীব্র অনুভূতিই হয়।

চোখ বন্ধ করে, মনপ্রাণ অনুভূতি একত্র করে শাজাহান সুজার ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে রুমী।

...শাজাহান সুজা ছবি আঁকছে—যন্ত্রণাকাতর ভীত একটা শিশুর মুখ। সামনে তার মডেল একটা ছোট শিশু হাত-পা শক্ত করে চেয়ারের সাথে বাঁধা। একটু পর পরই সে একটা বড় ধারালো ছুরি দিয়ে ভয় দেখিয়ে শিশুটার এখানে সেখানে খোঁচা মারছে। প্রাণপণে আর্তনাদ করে ওঠে শিশুটা, তীক্ষ্ণ চোখে সে তখন শিশুটাকে লক্ষ্য করে। তারপর তুলিতে রঙ লাগিয়ে ছবিতে মন দেয়। ছবিতে শিশুটির চেহারা এই শিশুটির মতো নয়। সে ইচ্ছা করেই কোনো নির্দিষ্ট শিশুর চেহারা নেয়নি, শুধু তাদের যন্ত্রণার অভিব্যক্তিটি ধরার চেষ্টা করেছে। আশ্চর্য রকম জীবন্ত এই ছবিটি, হঠাৎ দেখলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্তের জন্যে থেমে যেতে চায়। শাজাহান সুজার ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেছে, এখন সে খুব সূক্ষ্ম ক'টি

জিনিস দেখে নিতে চায়। বাড়তি আলো লাগিয়েছে আজ, একটা ক্যামেরা রেখেছে বাচ্চাটির যন্ত্রণাকাতর মুখের ছবি তুলতে। যে অভিব্যক্তি তার আঁকা ছবিতে ফোটানোর চেষ্টা করেছে ক্যামেরার ফিল্মে তা ধরা পড়ে না, তবু শিশুগুলির ছবি তুলেছে সে, কে বলতে পারে হয়তো পরে কাজে লাগবে।

ছবিটির এখানে সেখানে তুলির একটি দুটি পোঁচ দিয়ে মাথা সরিয়ে দেখে শাজাহান সুজা। মুখে ওর পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু থেকে থেকে তার ভেতরে একটা দুশ্চিন্তা এসে উঁকি দিচ্ছে। পুলিস অফিসার কি করে তাকে সন্দেহ করলো? ভাগিস্য জানালা দিয়ে সে পুলিসের জীপটা দেখেছিল, বাচ্চাটির মুখ শক্ত করে বেঁধে আলমারির পেছনে গোপন জায়গাটাতে লুকিয়ে রাখার মতো সময় পেয়েছিল সে। কিন্তু পুলিস অফিসার বুঝলো কি করে? সবচেয়ে অবাক লাগে যখন হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভেতরে ভেতরে হঠাৎ অন্য কেউ যেন কথা বলে ওঠে। কে জানে ঐসব মৃত শিশুদের আত্মা মিছিল করে তাকে মারতে আসে কিনা।

এসব ভেবে শাজাহান সুজার হাসি পেয়ে যায়, কিন্তু ছবিটির দিকে তাকিয়ে আবার সে গম্ভীর হয়ে পড়ে। ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি। এটা শেষ করে মারা গেলেও তার দুঃখ নেই। কি আনন্দ! নিখুঁত একটা ছবি এঁকে এতো আনন্দ সে জানতো না। নিখুঁত ছবি ক'টি আছে পৃথিবীতে? একেই বোধ হয় সৃষ্টি বলে—সৃষ্টি! বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে ঈশ্বর বুঝি এরকম আনন্দ পেয়েছিলেন। সে যেটা করেছে সেটাই তো সৃষ্টি—অসাধারণ সৃষ্টি। যুগ যুগ ধরে মানুষ জানবে যন্ত্রণা কাকে বলে, মৃত্যুভয় কাকে বলে। যারা যন্ত্রণাকে কোনদিন অনুভব করেনি তারা যন্ত্রণাকে অনুভব করবে। জীবন্ত মানুষ মৃত্যুর আগেই পারবে মৃত্যুকে অনুভব করতে।

শাজাহান সুজার চোখে পানি এসে যায়। এরকম মহান একটা সৃষ্টির জন্যে না হয় ক'টা প্রাণ গেলই। আর সে তো খুঁজে খুঁজে গরীব, দুঃখী, ভাগ্যহীন শিশুদেরই বেছে নিয়েছে। এরা বড় হলে তো অনুভূতিহীন নির্বোধ মানুষ হয়েই বড় হতো, ক্ষুধার অনুভূতি ছাড়া আর কি অনুভূতি আছে এদের? সুন্দর কিছু দেখার, অনুভব করার ক্ষমতা এদের কখনো হতো না। পৃথিবীটা তো এদের জন্যে তৈরি হয়নি, এরা কীট পতঙ্গের মতো জন্মায়, কীট পতঙ্গের মতো মারা যায়। অল্প ক'জন মানুষ শুধু প্রতিভা নিয়ে জন্মায়, ওদের দেখার চোখ থাকে, বোঝার ক্ষমতা থাকে, অনুভব করার শক্তি থাকে, পৃথিবীটা তো তাদের জন্যেই। অন্যেরা শুধু পেটের ক্ষুধা, বড় জোর দেহের ক্ষুধা নিয়ে বেঁচে থাকে। ওদের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মাঝে পার্থক্য কি?

অপলক দৃষ্টিতে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকে শাজাহান সুজা, ওর মুখ কোমল হয়ে আসে। চোখ থেকে মমতা যেন বৃষ্টির ফোঁটার মতো গড়িয়ে পড়ে। এরকম পরিতৃপ্তি ওর জীবনে আর কখনো আসেনি। ছবিটির দিকে তাকালে মনে হয় যন্ত্রণা কাতর একটি শিশুর মুখ, ভালো করে দেখলে চোখে পড়ে শুধু যন্ত্রণা নয় আরও কিছু আছে এতে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে ছোট একটা শিশু যখন তার যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে ভাগ্যের কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয় তখন তার চোখে মুহূর্তের জন্যে যে বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে

www.MurchOna.com

ওঠে, এটি সেই মুহূর্তের ছবি। যন্ত্রণা যখন ভীতির রূপ নেয়, আশা যখন ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে, সুখ দুঃখ যখন অর্থহীন হয়ে যায় এটি ঠিক সেই পরিবর্তনের মুহূর্ত।

ছবি আঁকা শেষ হয়েছে। তুলিটা রেখে দিয়ে সে একটু পিছিয়ে এসে দাঁড়ায়। আহা। কি ছবি। ঘরের আলোগুলি একটু সরিয়ে দেয়, অন্য দিক থেকে আলো এসে পড়ায় ছবিটা একটু অন্যরকম লাগতে থাকে। জিভ দিয়ে একটা আনন্দের শব্দ করলো শাজাহান সুজা।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল বাচ্চাটা, এবারে হঠাৎ যন্ত্রণার অস্ফুট একটা শব্দ করলো। শাজাহান সুজা ভুরু কুঁচকে বাচ্চাটার দিকে তাকায়। সে ভুলেই গিয়েছিল বাচ্চাটার কথা। এর প্রয়োজন শেষ, পারলে সে ছেড়েই দিত বাচ্চাটাকে। তেলাপোকা মারতেও তো খারাপ লাগে, আর এ তো মানুষের বাচ্চা। কিন্তু ছাড়তে পারবে না সে, জানাজানি হয়ে যাবে তাহলে। মরার আগে একেকটার গায়ে কি ভয়ানক শক্তি এসে যায়, শাজাহান সুজার মনের আনন্দটা বিরক্তিতে ম্লান হয়ে আসে। কম ঝামেলায় কিভাবে বাচ্চাটাকে মারা যায় ভাবতে বসলো সে। মারার পর এটাকে আবার বাইরে নিয়ে ফেলে আসতে হবে, কে জানে ঐ মাথা খারাপ পুলিস অফিসার আবার তার ওপর পাহারা বসিয়ে রেখেছে কিনা। তাহলে সে এটাকে এখন বাইরে নিয়ে ফেলতেও পারবে না। হয়তো কেটে টুকরো টুকরো করে ছোট ছোট প্যাকেটে ভরে...ভাবতেই শাজাহান সুজার মন বিরক্তিতে বিষিয়ে ওঠে।

মনের এত পরিতৃপ্তির ভাবটা এই বাচ্চাটার জন্যে নষ্ট হয়ে গেল। শাজাহান সুজা এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারে বাচ্চাটাকে। এক লাথিতে মরে গেলেও চুকে যেতো, মরেও না শালার বাচ্চা। বাচ্চাটা প্রচণ্ড লাথি খেয়েও কেন জানি এবারে ডুকরে কেঁদে উঠলো না, হয়তো বুঝতে পেরেছে এখন ওকে কি করা হবে। অদ্ভুত বোবা একটা দৃষ্টিতে শাজাহান সুজার দিকে তাকিয়ে রইলো সে, দেখে আরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার।

ফ্রিজ খুলে একটা বিয়ারের বোতল বের করে আনতে হলো তাকে। সোফায় বসে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে থাকে কি করা যায়।

এদিকে মনপ্রাণ এক করে শাজাহান সুজার ওপর নিজের প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে রুমী, ও জানে না কি করতে হয়, কি করবে কোনো ধারণা নেই। প্রথমে চেষ্টা করছে শাজাহান সুজার অস্তিত্ব থেকে নিজের অস্তিত্ব আলাদা করে রাখতে। প্রথম প্রথম পারছিল না, বারবার মনে হচ্ছিল সে নিজেই শাজাহান সুজা। আস্তে আস্তে সেটা সম্ভব হয়েছে, এখন শাজাহান সুজার অস্তিত্বের মাঝে থেকেও সে আলাদা হয়ে আছে। শাজাহান সুজার অস্তিত্বে বসে থেকে নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে সে। কোনো লাভ হচ্ছে না, শাজাহান একমনে বিয়ার খেয়েই চলছে। সমস্ত শক্তি একত্র করে সে ডাকার চেষ্টা করলো শাজাহান সুজাকে, কোনো লাভ হলো না। রুমী জানে একবার যদি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তবে নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে যাবে হাজার গুণ, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও বেড়ে যাবে অনেকখানি। তাই সে হাল ছাড়লো না, আবার ডাকলো শাজাহান সুজাকে—আবার ডাকলো—কিন্তু কোনো লাভ হলো না। শাজাহান সুজা সোফায় বসে চুক চুক করে বিয়ার খেয়েই চলেছে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বিশ্বাস সঞ্চয় করার চেষ্টা করে রুমী। নিশ্চয়ই পারবে সে, নিশ্চয়ই পারবে। তাকে পারতেই হবে, ছোট একটা শিশুর জীবন নির্ভর করছে তার ওপর। আর কোনো বিকল্প নেই, তাকে পারতেই হবে—পারতেই হবে। রুমী মনপ্রাণ

www.MurchOna.com

একত্র করে ডাকে শাজাহান সুজাকে, আর কি আশ্চর্য শাজাহান সুজা চমকে পিছনে তাকায়। কেউ নেই কোথাও অথচ কি আশ্চর্য। ও স্পষ্ট শুনলো কে যেন ওকে ডাকলো।

আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে বের করে দেয় রুমী। পেরেছে সে, শাজাহান সুজার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এবার সে তাকে শিক্ষা দেবে, এমন শিক্ষা দেবে, যে তার আত্মা নরকে গিয়েও ভুলতে পারবে না।

শাজাহান সুজা।

শাজাহান সুজা আবার চমকে পিছনে তাকালো, আবার সে শুনেছে কেউ যেন তাকে ডাকলো। কি আশ্চর্য, আধ বোতল বিয়ার খেয়েই তার নেশা হয়ে গেল নাকি? শাজাহান সুজা বিয়ারের বোতলটা রেখে দেয়। এখনো অনেক কাজ বাকি, নেশা করার সময় হয়নি। কিন্তু ভেতরটা জানি কেমন করতে থাকে। অনেকদিন পর ভয় পেয়েছে সে।

শাজাহান সুজা, ডান দিকে তাকাও।

শক খাওয়া লোকের মতো চমকে ডান দিকে তাকালো শাজাহান সুজা। কেউ নেই।

বাম দিকে তাকাও, শাজাহান সুজা।

টেবিল ধরে কোনমতে বাম দিকে তাকায় শাজাহান সুজা। জানে কেউ নেই, তবু তাকিয়ে দেখলো। কি হয়েছে ওর? বাথরুমে গেল মাথায় পানি দিতে।

রুমী আস্তে আস্তে বললো, রেজরটা দেখো শাজাহান সুজা।

শাজাহান সুজা ভয়ে ভয়ে রেজরটার দিকে তাকায়।

হাত বাড়িয়ে তুলে নাও দেখি।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাজাহান সুজা হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় ওটা।

এবারে গলায় একটা পোঁচ লাগাও দেখি চাঁদ!

শাজাহান সুজা চিৎকার করে হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল রেজরটা। পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে।

দাঁতে দাঁত ঘষে রুমী, কোথায় যাবে তুমি বাছাধন?

শাজাহান সুজা ফ্রিজ খুলে ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল বের করে ঢক্ ঢক্ করে দুই ঢোক খেয়ে নিল। মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গেছে। বাচ্চাটাকে শেষ করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। অনেক ধকল গিয়েছে শরীরের ওপর দিয়ে। রান্নাঘর থেকে একটা বড় ছুরি নিয়ে স্টুডিওতে চলে এলো সে।

একটু চমকে ওঠে রুমী, শাজাহান সুজাকে থামাতে হবে। মনপ্রাণ একত্র করে সে ওকে আদেশ দিতে থাকে, এক পা এগুবে না তুমি, দাঁড়াও যেখানে আছো।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শাজাহান সুজা। দরদর করে ঘামছে সে। সারা মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ভয়ে।

তোমার আর কোনো শক্তি নেই, শাজাহান সুজা। প্রথমবার কথাটা এমনি বললো রুমী, দ্বিতীয়বার বললো অনেক জোর দিয়ে, তৃতীয়বার শুধু জোর দিয়ে নয়, বিশ্বাস নিয়ে।

শাজাহান সুজার মনে হলো সত্যিই তার কোনো শক্তি নেই। হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবার মতো অবস্থা এখন ওর। কোনমতে পা টেনে টেনে টলতে টলতে সোফায় এসে বসে পড়লো। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। ভয় পেয়েছে সে, প্রচণ্ড ভয়!

www.MurchOna.com

বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে রুমীও, প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে ওর। একটি করে আদেশ দেয় শাজাহান সুজাকে আর সেটি কাজে খাটাতে গিয়ে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তার। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে ওর, কিন্তু উঠে পানির গ্লাসটা আনতেও ভয় পাচ্ছে সে যদি সেই সময়টাতে কিছু একটা করে ফেলে বাচ্চাটাকে, চোখ বন্ধ করে সে দেখে শাজাহান সুজাকে, মড়ার মতো পড়ে আছে সোফায়। হয়তো ওর শাজাহান সুজার বাসার কাছে চলে যাওয়া উচিত, তাহলে ওর এতো পরিশ্রম হবে না। কাছাকাছি থাকলে অনুভূতিটা অনেক তীব্র হয় আজ বিকেলেই সে দেখেছে। কাছে থাকলে আরও শক্ত করে শাজাহান সুজাকে ধরতে পারবে, আরও ভালো করে শিক্ষা দিতে পারবে।

উঠে দাঁড়ায় রুমী, ঢক্ ঢক্ করে গ্লাসের পানিটা শেষ করে পায়ে জুতো পরে নেয়। এতো রাতে রিকশা না পেলে তাকে হয়তো হেঁটেই যেতে হবে। জুতো পায়ে অনেক তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়। শাজাহান সুজা এখন মরার মতো পড়ে আছে, কতক্ষণ পড়ে থাকবে কে জানে, এর মাঝে রুমীকে যতোটুকু সম্ভব ওর কাছাকাছি চলে যেতে হবে। দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে প্রায় ছুটতে থাকে সে।

অন্ধকার রাত। ঢাকা শহরেই রাতে এতো অন্ধকার নামতে পারে, গ্রামেগঞ্জে বনেবাদাড়ে না জানি এখন কত অন্ধকার! শহরে কেউ কখনো আকাশের দিকে তাকায় না। আকাশে চাঁদ ওঠে, আবার চাঁদ ডুবে যায়, কেউ খেয়াল পর্যন্ত করে না। রুমীর মনে আছে রাতে পড়াশোনা করে ঘুমোনোর সময় একদিন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে কত বড় একটা চাঁদ। দেখে সে কি অবাক, কতদিন পরে চাঁদ দেখলো। সেই ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসে চাঁদ দেখতো, ওর মা গুনগুন করে কি যেন গান গেয়ে ওকে আদর করতেন। তারপর কতদিন হয়ে গেছে আর সে আকাশের দিকে তাকায়নি! আজ মাঝরাতে রিকশায় বসে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ওর মায়ের কথা মনে পড়লো, কোথায় আছেন ওর মা? ওর ভেতরে কেমন একটা দুঃখ বোধ জেগে ওঠে, কি মানে আছে এই জীবনের? সে কি করছে এখন? কি প্রয়োজন তার এইসব করার?

ঠিক রাস্তার মোড়ে একজন লোক লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে—যে কেউ দেখে বলে দিতে পারবে এ পুলিসের লোক। পুলিসের সাদা পোশাকের লোকগুলিকে দেখতে সবসময় একরকম দেখায় কেন কে জানে। বোধহয় তারা একই ধরনের কাপড় পরে, একই ধরনের কাজকর্ম করে—হয়তো যেখানে তাদের কাজ শেখানো হয় সেখানে সবাইকে একই জিনিস শেখানো হয়। লোকটি সিগারেট টানতে টানতে খুব নিস্পৃহ ভাবে রুমীর দিকে তাকালো যেন রুমী কে তাতে তার কিছুই এসে যায় না।

কি ভেবে সেখানেই নেমে পড়লো রুমী, পুলিসের লোকটাকে কিছু একটা বলে গেলে হতো। রুমী একটু দ্বিধা করে, কে জানে হয়তো এ পুলিসের লোক নয়। রুমী চেষ্টা করলো লোকটি কি ভাবছে বুঝতে, কিন্তু পারলো না। আগেও দেখেছে স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনাগুলো সে বুঝতে পারে না, শুধু খারাপ অশুভ কথাগুলিই শুনতে পায়।

একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলো রুমী, আপনি কি পুলিসের লোক?

লোকটা হকচকিয়ে গিয়ে বললো, আপনি…আপনি কিভাবে জানলেন?

www.MurchOna.com

জানি না বলেই তো জিজ্ঞেস করলাম। আমি আন্দাজ করেছিলাম আপনারা কেউ কাছাকাছি থাকবেন। লোকটিকে আরও ঘাবড়ে না দিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললো সে। পুলিস অফিসারের নাম করে বললো, সে তাঁকে খুব ভালো করে চেনে এবং তাঁর খবরের ওপর ভিত্তি করেই শাজাহান সুজার বাসার ওপর পাহারা বসানো হয়েছে। শুনে লোকটি একটু সহজ হলে রুমী বললো, আপনাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।

কি উপকার?

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু পুলিস নিয়ে আসতে হবে। আপনাদের অফিসারকে আমার নাম বলে ফোন করলেই হবে।

লোকটি চোখ কপালে তুলে বললো, পুলিস? সর্বনাশ! এটা খুব গোপন ব্যাপার, আমি এখানে আছি সেটা পর্যন্ত ডিপার্টমেন্ট জানে না।

জানি। রুমী ঠাণ্ডা গলায় বললো, গোপন ব্যাপার আর গোপন নেই। আমি শাজাহান সুজার বাসায় ঢুকছি ওকে হাতেনাতে ধরার জন্যে।

লোকটি অবাক হয়ে রুমীর দিকে তাকালো, এর মাথা খারাপ না আর কিছু! কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে রুমীকে ভীষণ চমকে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলতে দেখলো। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনেছে রুমী—চোখ বন্ধ করে দেখতে পায় শাজাহান সুজা ছুরি হাতে বাচ্চাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বেঁচে থাকার আদিম প্রবৃত্তির বসে বাচ্চাটা প্রাণপণে চেষ্টা করে চেয়ারসহ মাটিতে পড়ে গেছে। ছুরি তার হাতের খানিকটা কেটে ফেলেছে কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেছে সে। প্রচণ্ড রেগে গেছে শাজাহান সুজা, মুখ বিকৃত করে আবার এগিয়ে আসছে সে।

না! প্রাণপণ চিৎকার করে ওঠে রুমী, থাম-থাম শুয়োরের বাচ্চা!

শক খাওয়া লোকের মতো ঘুরে দাঁড়ায় শাজাহান সুজা।

এক পা নড়েছিস কি তোর জান শেষ করে দেবো—দাঁতে দাঁত ঘষে রুমী বলতে থাকে, আর একটু নড়েছিস কি তোর জিভ টেনে বের করে ফেলবো।

পুলিসের লোকটি বিস্ফারিত চোখে রুমীর দিকে তাকিয়ে থাকে, একমুহূর্তের জন্যে সে ভেবেছিল রুমী বুঝি তাকে কিছু বলছে। কিন্তু রুমীর দৃষ্টি অন্য কোথাও, কথা বলছে অনেকটা নিজের মনে। দেখে ভয় হয়, মনে হয় সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। কি ভয়ানক চেহারা হয়ে গেছে একমুহূর্তে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, শক্ত চোয়াল, চোখ টকটকে লাল, কিন্তু পাতা নড়ছে না, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললো রুমী, আমি আসছি। তোকে আজ দেখে নেবো, শয়তানের বাচ্চা।

পুলিসের লোকটা অবাক হয়ে দেখলো, অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে শাজাহান সুজার বাসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রুমী, কেন জানি ভয়ে ওর সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। আরও আধঘন্টা পরে অন্য আরেকজন এসে তাকে ছুটি দেয়ার কথা কিন্তু এতোক্ষণ অপেক্ষা করার সাহস নেই তার, তক্ষুণি সে ছুটলো কাছাকাছি পুলিস ফাঁড়ি থেকে ফোন করার জন্যে।

লোহার গেট বাসার সামনে, মস্ত তালা ঝুলছে। রুমী একমুহূর্ত দ্বিধা না করে গেট টপকে ভেতর ঢুকে পড়ে। উপরে কাঁটাতার দেয়া, ওর হাত ছড়ে গেছে কিন্তু এখন সে-

নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। কাঁকর বিছানো পথ, দুধারে ফুলের গাছ, অযত্নে, অবহেলায় একটা বুনো রূপ নিয়েছে। ঝিঁঝি ডাকছে কোথায়, মুহূর্তের জন্যে থামতেই বোঝা গেল চারদিক কি ভয়ানক নীরব হয়ে আছে।

দরজা খোলো।

না।

দরজা খোলো, শাজাহান সুজা।

না–না···

প্রচণ্ড জোরে ধমকে ওঠে রুমী, দরজা খোল, শুয়োরের বাচ্চা।

শাজাহান সুজা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। রুমী বাইরে দাঁড়িয়ে শাজাহান সুজাকে দরজার কাছে টেনে আনে খুব সহজে। ওকে বাধ্য করে দরজা খুলতে। শাজাহান সুজা ছিটকিনি খুলে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, লাথি মেরে দরজা খুলে ফেললো রুমী। ভয়ে ছিটকে সরে গেল শাজাহান সুজা, ড্রয়ার হাতড়াচ্ছে প্রাণপণে, পিস্তলটা খুঁজছে ওর।

ততোক্ষণে রুমী ঢুকে গেছে ভেতরে।

কি, কি চান আপনি?

রুমী হাসলো। বিকারগ্রস্ত লোকের হাসি। কি চাই? দেখবে, এক্ষুণি দেখবে।

শাজাহান সুজা তখনো ড্রয়ার হাতড়ে যাচ্ছে, রুমী জানে ও পিস্তলটা খুঁজছে কিন্তু বাধা দিল না সে। কি করবে ও পিস্তল দিয়ে? তাকে গুলি করবে? রুমী জানে সে ইচ্ছা করলে এখন শাজাহান সুজা একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারবে না। কি প্রচণ্ড শক্তি ওর ভেতরে! ইচ্ছা করলে শাজাহান সুজার জিভ টেনে বের করতে পারে সে, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলতে পারে। ও ইচ্ছা করলে খুলি ফেটে তার মস্তিষ্ক বের হয়ে যাবে এখন—পিস্তল দিয়ে কি করবে?

খুঁজে পেয়েছে সে পিস্তলটা—তুলে ধরলো রুমীর দিকে।

রুমী আবার হাসার ভঙ্গি করে, গুলি করতে চাও? তাহলে ঘুরিয়ে নিজের মাথার দিকে নাও।

শাজাহান সুজার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে ওর, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত উঠে যাচ্ছে তার মাথার দিকে।

কি, গুলি করবে?

প্রাণপণ চেষ্টায় মাথা নাড়লো, না–না···

পিস্তলটা আমার দিকে ছুঁড়ে দাও। শাজাহান সুজা পিস্তলটা ছুঁড়ে দেয়। রুমী জীবনে পিস্তল ভালো করে দেখেনি পর্যন্ত, দেখার ইচ্ছাও নেই। লাথি মেরে পিস্তলটা সরিয়ে দিলো দূরে।

কি, কি চান আপনি? শাজাহান সুজার কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভয়ে কাঁপছে।

অনেক কিছু চাই আমি। তোমাকে এমন শিক্ষা দিতে চাই···

কেন? কি করেছি আমি?

www.MurchOna.com

প্রচণ্ড রাগে রুমীর মুখ ভয়াবহ হয়ে ওঠে, কি করেছো তুমি? চিৎকার করে ওঠে রুমী, তুমি জানো না? রুমীর অদম্য ক্রোধ প্রচণ্ড একটা শক্তির মতো শাজাহান সুজাকে আঘাত করে, ছিটকে গিয়ে সে পড়ে এক কোনায়, প্রচণ্ড জোরে ওর মাথা ঠুকে যায় দেয়ালে। রুমীর রাগের দমকে দমকে ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে, মুখে ফেনা এসে যায় যন্ত্রণায়।

অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রুমী, আস্তে আস্তে শাজাহান সুজার কাঁপুনিও থেমে যায়। কোনমতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, প্রচণ্ড ভয়ে ওর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

তুমি কি করেছো তুমি জানো না?

শাজাহান সুজা মাথা নিচু করে থাকে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে কাতর ভঙ্গিতে বলে, কিন্তু আমি তো শুধু শুধু করিনি। এই দেখুন, এই ছবিটা আমি এঁকেছি, পৃথিবীর লোক এই ছবিটা পেতো না আমি যদি কিছু না করতাম···

কি ছবি এটা?

শাজাহান সুজা একটু আশায় ভর করে এগিয়ে আসে, ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, আপনিও বুঝতে পারবেন।

তাকিয়ে দেখলো রুমী।

শাজাহান সুজা দুর্বল ভাবে একটু হাসলো, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ এটা—'প্রিন্সে'র থেকে হাজার গুণ ভালো। এরকম আর হবে না—কখনো হবে না। রঙের কাজ আর টেকনিক ছেড়ে দিয়ে শুধু অভিব্যক্তিটা দেখুন।

খুব যত্নের ছবি তোমার?

হ্যাঁ। এটা শেষ করে আমার মরতেও দ্বিধা নেই। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে শাজাহান সুজা আস্তে আস্তে বলে, মরতেও দ্বিধা নেই।

সিগারেট খাও তুমি?

হ্যাঁ, খুব ব্যস্ত হয়ে শাজাহান সুজা পকেট হাতড়াতে থাকে। সিগারেট বের করে এগিয়ে দেয় রুমীর দিকে।

ম্যাচটা বের করো।

শাজাহান সুজা একটা দামী সিগারেট লাইটার বের করে।

সাবধানে ছবিটার নিচে লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরো।

প্রচণ্ড ভাবে চমকে উঠলো শাজাহান সুজা, কি বলছে সে? একমুহূর্তের জন্যে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না ও।

নিচে লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরো।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল শাজাহান সুজা, আপনি বুঝতে পারছেন না এই ছবির মূল্য। আমাকে মেরে ফেলুন, যা খুশি করুন, কিন্তু এই ছবিটাকে বেঁচে থাকতে দিন।

ছবির নিচে লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরো।

কাতর অনুনয়ে শাজাহান সুজার গলার স্বর ভেঙে পড়ে, আপনি একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। তাজমহলকে কেউ যদি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় আপনার কেমন লাগবে? দা

www.MurchOna.com

ভিঞ্চির মোনালিসাকে কেউ যদি পুড়িয়ে দেয় আপনার কেমন লাগবে? মাইকেল এঞ্জেলোর পিয়েতাকে কেউ যদি ভেঙে ফেলে কেমন লাগবে আপনার? আপনি বিশ্বাস করুন এটা ঠিক সেরকম একটা সৃষ্টি। এটা নষ্ট করার অধিকার কারো নেই। আমি অপরাধ করেছি, আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিন, আমার ছবির ওপর প্রতিশোধ নেবেন না। একটি বার পৃথিবীর লোককে এই ছবি দেখতে দিন।

লাইটারটা জ্বালিয়ে ছবির নিচে ধরো।

দোহাই আপনার—এটা আমার সন্তানের মতো। আমার যদি একটা সন্তান থাকতো তাকে কি আপনি মারতেন? আমি যতো দোষই করি আমার সন্তানের তো কোনো দোষ নেই। তাকে আপনি বাঁচতে দিন···

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে ফুঁসে ওঠে রুমী, তোমার সন্তানের মতো! যাদের তুমি মেরেছ তারা কারো সন্তান ছিল না?

রুমীর কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড একটা আঘাতে শাজাহান সুজা ছিটকে মাটিতে পড়ে। রুমীর রাগ কমে না আসা পর্যন্ত সে যন্ত্রণায় কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়ায়। কপালের কাছে কেটে গেছে ওর, ফুলে উঠছে ধীরে ধীরে। একটা চোখ প্রায় বুজে গেছে। কাতর অনুনয়ের দৃষ্টিতে শাজাহান সুজা রুমীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রুমী ওকে আবার আদেশ দেয় ছবিটাতে আগুন ধরানোর জন্যে। শাজাহান সুজা দুই হাত জোর করে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। রুমী পাথরের মতো এবারে নিজের শক্তি ব্যবহার করে। শাজাহান সুজা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঁপা কাঁপা হাতে লাইটারটা জ্বালিয়ে, আস্তে আস্তে আগুনটা ছবির নিচে ধরে। ওর মুখ প্রচণ্ড হতাশায় বিকৃত হয়ে আছে, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে আগুন ধরে গেল একপাশে। শাজাহান সুজা প্রাণপণ চেষ্টা করলো হাত দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিতে, কিন্তু ওর কোনো ক্ষমতা নেই। রুমীর ইচ্ছার দাস হয়ে ও দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। আস্তে আস্তে আগুনটা ছড়িয়ে পড়ছে, দ্রুত এগিয়ে এসে গ্রাস করে নিচ্ছে ছবিটাকে।

আর্তনাদ করে উঠল শাজাহান সুজা, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাটিতে মাথা কুটতে থাকে প্রচণ্ড দুঃখে। ওর সারা জীবনের স্বপ্ন ওর চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে, ও একটা ফটো পর্যন্ত তুলে রাখেনি ওটার। আর দেখতে পারলো না, চোখ বন্ধ করে ফেললো, শাজাহান সুজা।

চোখ খোলো, শাজাহান সুজা।

শাজাহান সুজার চোখ খুলে গেল ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ওর চোখের সামনে পুরো ছবিটা ঢেকে গেল জ্বলন্ত আগুনের শিখায়। অনেক ওপরে উঠে গেল আগুনের শিখা, ধোঁয়ায়ভরে গেছে সারা ঘর, খক্ খক্ করে কাশতে থাকে রুমী।

শাজাহান সুজাকে ডাকলো রুমী। তার উত্তর দেয়ার ক্ষমতা নেই, অর্থহীন বোবা দৃষ্টিতে রুমীর দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

খুব একটা সৃষ্টি করেছিলে, বাচ্চাদের খুন করে সৃষ্টি করো তুমি! বাচ্চারা সৃষ্টি না, সৃষ্টি তোমার ঐ আর্ট! প্রচণ্ড ঘৃণায় রুমীর মুখ বিকৃত হয়ে উঠতেই আবার শাজাহান সুজা ছিটকে পড়ে মাটিতে। রুমীর তীব্র দৃষ্টিতে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে যন্ত্রণায়।

www.MurchOna.com

ভীষণ দুর্বল লাগতে থাকে রুমীর। ও আস্তে আস্তে সোফায় গিয়ে বসে, পুলিস এসে যাবে যে কোনো মুহূর্তে, তখন ওর কাজ শেষ। হঠাৎ ওর চোখ পড়ে বাচ্চাটার ওপর, রুমী ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল। শক্ত করে বাঁধা চেয়ারে, রক্তাক্ত শরীর, বাম হাত থেকে তখনো রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। রুমী চোখের দৃষ্টি কোমল করে ওর দিকে এগিয়ে যায়, বাচ্চাটা ভীত চোখে ওকে লক্ষ্য করে, ওর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

ভয় কি তোমার? ভয় নেই, তোমাকে আর কেউ কিছু করতে পারবে না। রুমী ওর দড়ির বাঁধন খুলে দিতে লাগলো।

বিড়বিড় করে কথা বলছে শাজাহান সুজা। কান পেতে শোনার চেষ্টা করে রুমী, প্রথমে মনে হচ্ছিল অসংলগ্ন কথা, কিন্তু আসলে তা নয়। প্রচণ্ড দুঃখে ওর বুক ভেঙে গেছে তাই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে নিজেই। বলছে, এটা পুড়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে? আবার আঁকবো আমি, আবার আঁকবো। আরও ভালো করে আঁকবো আমি, আরও অনেক যত্ন করে। আমি শিল্পী, আমার চোখ আছে, আমার দেখার ক্ষমতা আছে, আমার সৃষ্টির ক্ষমতা আছে! ক'জনের আছে আমার মতো ক্ষমতা? আমি আবার সৃষ্টি করবো। দরকার হলে আবার ধরে আনবো নোংরা জানোয়ারগুলোকে, গলা টিপে মেরে...

প্রচণ্ড রাগ রুমীর শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতে থাকে—প্রচণ্ড রাগ। দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, আবার ছবি আঁকবে তুমি? আবার সৃষ্টি করবে? তোমার ঐ চোখ দিয়ে তুমি দেখবে আর সৃষ্টি করবে?

রুমী ওর দিকে এগিয়ে যায়, তোমার চোখ আমি ছিঁড়ে নেব, ছিঁড়ে উপড়ে নেব। চোখ উপড়ে নেবার ভঙ্গি করে রুমী, আর হঠাৎ ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে এলো শাজাহান সুজার চোখ থেকে। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে দুই চোখ ঢেকে ফেললো শাজাহান সুজা, হাতের ফাঁক দিয়ে গল গল করে রক্ত বের হতে থাকে।

রুমীর মনে হয় তার মাথাটা হালকা হয়ে গেছে। সমস্ত ঘরটা যেন ওর চোখের সামনে ঘুরে ওঠে। সাবধানে সে সোফার হাতল ধরে বসার চেষ্টা করলো, ঘরটা আরও জোরে ঘুরছে, আলোগুলি যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ও তাকিয়ে থেকেও আর দেখতে পাচ্ছে না। কোলাহলের মতো শব্দ ভেসে আসতে থাকে, ঢেউয়ের মতো সে-শব্দ এগিয়ে আসছে, আস্তে আস্তে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। রুমী সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে খুব ধীরে ধীরে জ্ঞান হারালো।

বাইরে তখন পুলিসের জীপ এসে থেমেছে।

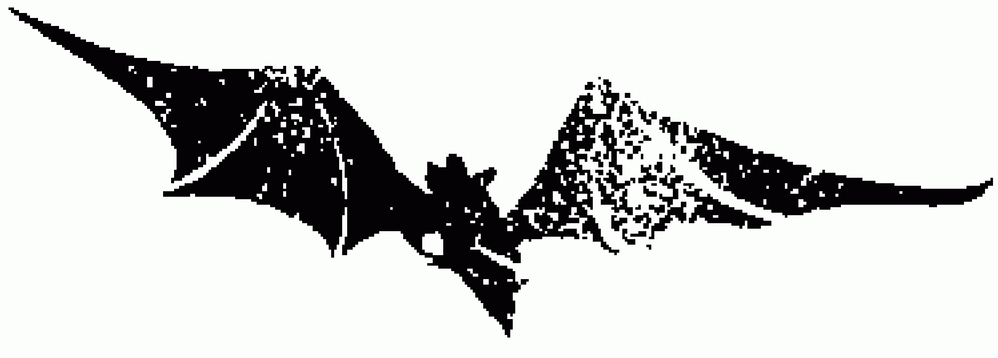

www.MurchOna.com

পরিশিষ্ট

এগারো

শাজাহান সুজাকে অন্ধ অবস্থায় তার বাসায় গ্রেফতার করা হয়। কি এক অজ্ঞাত কারণে তার দুই চোখেরই নার্ভ ছিঁড়ে গিয়ে সে অন্ধ হয়ে গেছে। বহুদিন চিকিৎসাধীন থাকলো সে। প্রচণ্ড শকে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে বলে তার বিচার অনেকদিন বন্ধ রাখা হয়েছিল। বিচারের বিশেষ কিছু ছিলও না, নিজেই সব ক'টি শিশুহত্যার অপরাধ স্বীকার করেছে। এ নিয়ে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তার কোনো অনুতাপ ছিল না। বিচারে ওর মৃত্যুদণ্ডই হতো কিন্তু রায় বের হওয়ার আগেই সে জেলখানায় মারা গেল। অনেকে বলে আত্মহত্যা করেছে, অনেকে বলে জেলখানায় অন্যান্যরা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। কোন্‌টি সত্যি এখনো সেটা ভালো করে জানা যায়নি। কিভাবে মারা গেছে সেটা নিয়ে বিশেষ কারো মাথাব্যথা নেই, শাজাহান সুজা যে মারা গেছে সেটাই অনেকের কাছে একমাত্র স্বস্তির কথা।

যে-রাতে শাজাহান সুজাকে গ্রেফতার করা হয়, সে-রাতে রুমীকেও তার বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়। রুমীর বাইশ বছরের জীবনে মস্তিষ্কে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপাচার করে তাকে বাঁচাতে হয়েছে। তার মস্তিষ্কের বড় একটা অংশ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারেরা সন্দেহ করেছিলেন সে হয়তো জ্ঞান বুদ্ধিহীন অথর্ব একটা মানুষে পরিণত হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল রুমী খুব ভালো ভাবেই সামলে উঠেছে। তার দৈহিক কোনো সমস্যাই হয়নি, বুদ্ধিমত্তাও পুরোপুরি স্বাভাবিক রয়েছে, কিন্তু স্মৃতি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে তার অতীতের একটি কথাও মনে করতে পারে না। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করলেন। শাজাহান সুজাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে সে একলাখ টাকা পুরোটাই পেয়েছিল। তার থেকে অনেকখানি ওর চিকিৎসার জন্যে ব্যয় করা হলো, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। অন্যেরা যদিও রুমীর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়াটা খুব গুরুত্ব নিয়ে দেখছিল তবু সে নিজে এ ব্যাপারে বেশি বিচলিত হয়নি। তার স্মৃতির কিছুই অবশিষ্ট নেই, তাই সে জানতোও না কি নিয়ে তার বিচলিত হওয়া উচিত।

রুমী একটু সুস্থ হওয়ার পর ওর বোন শানু ওকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। প্রথম প্রথম সে শানুকে দেখে একটু লজ্জা পেতো, এই সুন্দরী মেয়েটি তার বোন তার বিশ্বাস হতে চাইতো না। বোনের ছোট ছেলেটির সাথে তার ঘনিষ্ঠতা হলো খুব সহজে, বড়দের সাথেই তার কথাবার্তা বলতে অসুবিধে অসুবিধে হতো। কখন কিভাবে কি বলতে হয় সে তখনো শিখে উঠতে পারেনি। তার নাকি এম. এস. সি. পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, কিন্তু এ বছরটা অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই, যদিও সবাই চায় যে সে আবার ঢাকা গিয়ে পড়াশোনা শুরু করুক, কিন্তু তার নিজের সেরকম কোনো ইচ্ছা নেই। সে কেন গ্রামে থাকতে পারে না, এই সহজ ব্যাপারটা এখনো কেউ তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেনি। সে তার বোনের স্বামীর মতো দোকান দেবে বলায় একদিন সবাই এমন ভাবে তার মুখের উপর হেসে উঠেছিল যেন সে ভারি মজার কথা বলেছে। রুমী আজকাল তাই কাউকে কিছু বলে না, সে কি করবে সেটা সে নিজেই ঠিক করবে। তার নাকি অনেক টাকা জমা আছে

www.MurchOna.com

ব্যাংকে, সেটা কিভাবে তুলতে পারবে এখনো জানে না। জেনে নিতে পারবে সে ক'দিনের ভেতরেই। তখন টাকাটা তুলে এনে কংশ নদীর চরটা কিনে নেবে ও , ওখানে নাকি খুব ভালো ধান হয়। কিছু টাকা দিয়ে সে গ্রামের স্কুলটা ঠিক করিয়ে দেবে। হেড মাস্টারের সাথে কথা বলেছে গোপনে, সে চাইলেই তিনি তাকে একটা মাস্টারী দিয়ে দেবেন। স্কুলে অংক আর বিজ্ঞান পড়ানোর কেউ নেই, সে বি. এস. সি. তে অনার্স, তবুও একটু ভয়ে ভয়ে ছিল হয়তো অংক বিজ্ঞান সব ভুলে গেছে এই ভেবে, কিন্তু স্কুলের অংক বই খুলে দেখেছে খুব সহজ। কিছুই ভুলে যায়নি।

ক'দিন আগে ঢাকা থেকে কিবরিয়া চৌধুরী নামে একজন তার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, একসময়ে নাকি তার সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল। কেমন রাগী রাগী আর অসুখী মানুষের মতো চেহারা। তাকে অনেক বুঝিয়ে গেছেন যেন সে ঢাকা চলে আসে, যাওয়ার আগে তাঁকে চিঠি লিখলেই তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। ঠিকানা রেখে গেছেন তার কাছে। তাঁকে সে কিছু বলেনি, বললে ভদ্রলোক হয়তো রেগে যেতেন। কেউ গ্রামে থাকতে পারে সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। রুমী কিন্তু গ্রামেই থাকবে, যে যাই বলুক তাকে।

অনেক ঘুরে দেখেছে সে। সড়ক ধরে অনেক দূর হেঁটে গেছে, কি সুন্দর ধানের খেত দু'পাশে, বাতাসে যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আকাশে সাদা মেঘ এপাশ থেকে ওপাশে ভেসে ভেসে যায়। একদিন কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেল, রুমীর দেখে আশ মেটে না, বিজলী চমকাতে থাকে, তারপর কি গুড় গুড় মেঘের ডাক। রাখাল ছেলেরা গরু ছুটিয়ে নিয়ে আসছে গোয়ালে, উঠনে শুকাতে দেয়া ধান হৈ চৈ করে তুলে নিচ্ছে মেয়েরা, মোরগগুলি কঁক্ কঁক্ করে ঘরে ঢুকছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ভেবে। দেখতে দেখতে ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে এলো, ভেসে গেল যেন পৃথিবী। ভেজা শাড়ি পরে মেয়েরা ছুটোছুটি করতে থাকে, সংসারের খুঁটিনাটি জিনিস তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে চায়। এসব দেখে আনমনা হয়ে যায় রুমী।

নৌকো করে গিয়েছিল একবার, নদীর দু'তীরে তাকিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে যায়, দূরে কাশবন, ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল। আকাশে মেঘ, তার মাঝে সারি সারি বক উড়ে যায় দক্ষিণে। নদীর কালো পানি দেখে অবাক হয়ে যায় রুমী, কে জানে কত রহস্য লুকানো আছে ওখানে। জেলেরা মাছ ধরছে তার মাঝে হঠাৎ একটা শুশুক লাফিয়ে উঠে আবার ডুবে যায় পানিতে। সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোতে নিচু গলায় কথা বলে মাঝিরা, নৌকোর গলুইয়ে চুলো জ্বালিয়ে রান্না চাপায়। রাতে কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে খেতে বসে সবাই। লাল চালের ভাত, মুগের ডাল আর মাগুর মাছের ঝোল, খেতে অমৃতের মতো লাগে ওর।

ভোরে কুয়াশায় মাঠ ঢেকে থাকে, হুঁকো খেতে খেতে গল্প করে চাষীরা, তামাকের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আসে। লাঙ্গল গরু নিয়ে মাঠে চলে যায় সবাই ভোরের আলো ফোটার আগে। রুমী চুপচাপ ওদের দেখে, মনে হতে থাকে সে ওদেরই একজন। শহরে ও যাবে না, এখানেই থাকবে, এদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে থাকবে, যে যাই বলুক না কেন!

একটা মোটে জীবন, সেটা সে নষ্ট করবে না এবার।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

Pret by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com